আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা

জুলফিকার আহ্‌মদ কিস্‌মতী

লেখকের কথা

ইসলামী আন্দোলন এদেশে যতই এগিয়ে চলেছে, ততই এক শ্রেণীর লোক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ওলামায়ে কেরামের ব্যাপারে বেসামাল হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষ ও যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করার জন্যে আলেম সমাজের সংগ্রামী অতীতকে তারা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করছে। ঐসকল লোক নির্লজ্জের মতো বলে বেড়াচ্ছে যে, "আলেমরা এ যাবত কোথায় ছিলেন? তারাই আমাদের উন্নতি-প্রগতির পথে অন্তরায়।"

ওলামায়ে কেরামের রক্তপিচ্ছিল পথ বেয়ে আসা আজাদীর বদৌলতে যেসব লোক আজ বাড়ী-গাড়ীর অধিকারী হয়ে নিঃস্বার্থ সমাজসেবক আলেমদের বিরুদ্ধে এহেন অজ্ঞতাপূর্ণ উক্তি করে, মূলতঃ তাদের জবাব হিসেবেই এ বইখানা লিখতে শুরু করি; কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে দ্রুত প্রকাশের খাতিরে এবং কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় অনেক মহৎ সংগ্রামী জীবন সম্পর্কেও বইটিতে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া ইসলাম ও আজাদী আন্দোলনের এমন অসংখ্য বীর মোজাহিদ আলেমের কথাও জানা যায়, যাদের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যাবলী হাতের কাছে না পাওয়ায় সংক্ষিপ্তাকারেও তাঁদের সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যায়নি।

অধীনের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় যা কিছু পরিবেশিত হয়েছে, তাতে যদি কোনোরূপ তত্ত্ব ও তথ্যগত ভুল-ভ্রান্তি কারও নজরে পড়ে কিংবা কোনো মহৎ জীবনের তথ্য কারও জানা থাকে, সে ব্যাপারে অবহিত করলে কৃতার্থের সঙ্গে তা গ্রহণ করব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা যোগ করতে চেষ্টা করব। পুস্তকখানা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে তাদের ত্যাগী পূর্বসুরীদের প্রেরণায় উজ্জীবিত করে তুলুক -এটাই আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া রইল।

পরিশেষে অসংখ্য শ্রদ্ধা ও শুকরিয়া আমার মোহতারাম বুজর্গ উস্তাদ হযরত মওলানা নুর মোহাম্মদ আজমী সাহেবের প্রতি, যাঁর সংস্পর্শ ও মূল্যবান উপদেশাবলী আমাকে এ জাতীয় কাজে যথেষ্ট সাহায্য ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

—লেখক ২০শে জুলাই ১৯৭০
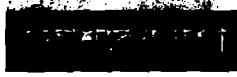
আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের ভূমিকা কি ছিল- এ সম্পর্কে উর্দু ভাষায় অসংখ্য বই-পুস্তক থাকলেও বাংলা ভাষাভাষী পাঠক মহল দীর্ঘ দিন থেকে এ জাতীয় বই-পুস্তকের অভাব অনুভব করে আসছেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, সাংবাদিক ও কলামিষ্ট মওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী সাহেব "আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা " বইখানা লেখার ফলে আমাদের দীর্ঘ দিনের একটি অভাব অনেকটা পূরণ হয়েছে বলে আমরা মনে করি। বইখানা সংক্ষিপ্ত হলেও ইংরেজদের দিল্লী দখলের পর থেকে ১৯৪৭ সালের আগষ্ট পর্যন্ত এক নজরে আলেমদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের একটি মোটামুটি চিত্র পাঠকের সামনে ভেসে ওঠে।

গ্রন্থখানার বিষয় বস্তুর গুরুত্বের প্রেক্ষিতেই কলকাতা থেকে প্রকাশিত "ইতিহাস অনুসন্ধান সিরিজ" ৫ম খন্ডের ৫০ পৃষ্ঠা থেকে ৮৭ পৃষ্ঠায় "মুসলিম লীগ রাজনীতি ঃ কয়েকটি প্রশ্নের বিশ্লেষণ" প্রবন্ধের লেখক অমলেন্দু দে স্থানে স্থানে "আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী" ভূমিকার বহু বরাত দিয়েছেন।

আমাদের বর্তমান প্রজন্ম, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীবৃন্দ বিশেষ করে ওলামায়ে কেরাম ও মাদ্রাসা ছাত্র যাদের একটি অংশ মাঝখানে রাজনীতি থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিলেন, তাদের জন্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে বইখানা যথেষ্ট প্রেরণাদায়ক হবে বলে আমরা মনে করি। বইটির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করে আমরা এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম।

পাঠক সমাজে বহু সমাদৃত এই বইখানা পুন:প্রকাশের পর জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও আলেম সমাজের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে অর্জিত স্বাধীন দেশে ৪৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস সম্বলিত লেখকের আরেকখানা গ্রন্থ প্রকাশের আশা রইল।

— প্রকাশক

অভিমত

[এক]

মহানবী (সাঃ)-এর যুগ থেকে নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ভূখন্ডের খোদা-বিমুখ শাসক ও রাষ্ট্রশক্তির দাসত্ব-নিগড় থেকে মানবতাকে আজাদ করার জন্যে মুসলমানগণ যে সংগ্রাম করে আসছে, সেটাই প্রকৃত আজাদী সংগ্রাম। এ সংগ্রামে তারা জয়যুক্তও হয়েছে। সারা বিশ্বে এক সময় শত শত বছর ধরে তাদেরই প্রভাব প্রতিপত্তি অধিক ছিল। কিন্তু শাসকদের অনেকের আদর্শচ্যুতি, ভোগবিলাস, আত্মবিলাস ও লোভলালসা হেতু এ জাতি তার শাসক সুলভ মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেকটা খুইয়ে বসে। পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম ভূখণ্ড ইংরেজদের করতলগত হয়ে যায়। দীর্ঘ নির্যাতনের পর মুসলমানদের মধ্যে পরিশেষে দেখা দেয় আত্মজাগৃতি-ফিরে আসে সম্বিত। তারা ইংরেজ শক্তির অত্যাচার, উৎপীড়ন, জেল-জুলুম, ফাঁসিকে এতটুকুও পরোয়া না করে ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন এমনকি নিজেদের জীবন কোরবান করেও পরিচালনা করেছেন মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক আন্দোলন ও সংগ্রাম।

পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের প্রথম হতে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত আলেম সমাজ ইংরেজ ও তাদের দোসর শিখ-হিন্দু নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করেছেন, তা এ দেশে ইসলামী মূল্যবোধের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক আন্দোলনেরই এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় ছিল।

এ অধ্যায়ে ইংরেজদের অমানুষিক জুলুম, সীমাহীন উৎপীড়ন বেপরোয়া ফাঁসীদান এবং হিন্দুদের মুসলিম-নিধন যজ্ঞকে বিন্দুমাত্রও পরোয়া না করে যে মহান নেতৃবৃন্দ পাক-ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হতে আরম্ভ করে পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং প্রায় দু'শ বছর অবিরাম সংগ্রামের পর ঈপ্সিত আজাদী হাসিল করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে যথাক্রমে সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভী, ইসমাইল শহীদ দেহলভী, হাজী শরীয়তুল্লাহ, হাজী শহীদ তীতুমীর (নেসার আলী), মওলানা বেলায়েত আলী, মওলানা ইয়াহ্হিয়া আলী, মওলানা জাফর থানেশ্বরী, মওলানা আহ্মদুল্লাহ, মওলানা মুহাম্মদ হোসাইন আজিমাবাদী, মওলানা ওবায়দুল্লা সিন্ধী, শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান, মওলানা শাববীর আহমদ ওসমানী, মওলানা হোসাইন

আহমদ মাদানী, মওলানা আজাদ সোবহানী, মওলানা হাসরাৎ মুহানী, মওলানা আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারী, মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী, মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী, পীর দুদু মিঞা, পীর বাদশাহ্ মিঞা, মওলানা রুহুল আমীন, ফুরফুরার পীর মওলানা আবুবকর সিদ্দীক, শর্ষিনার পীর মওলানা নেছারুদ্দীন সাহেব, মওলানা আবদুল হামীদ খান ভাষানী প্রমুখ আলেমের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। আর এ অধ্যায়ের শেষ প্রান্তে এসে, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষভাগ হতে যে বহু ইংরেজী শিক্ষিত মুসলিম নেতা এ সংগ্রামে শরীক হয়ে একে অধিকতর জোরদার করে তুলেছিলেন, তাদের মধ্যে মাসীহুলমূলক, মওলানা মোহাম্মাদ আলী, মওলানা শওকত আলী, নবাব সলীমুল্লাহ, কায়েদ আযম মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ, শেরে বাংলা মওলভী এ কে ফজলুল হক, হোসাইন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী প্রমুখের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

আজাদী আন্দোলনে "আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা"- পুস্তিকায় বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক মওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী ইসলামী রাষ্ট্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে এ দু'শতাব্দী ব্যাপী সংগ্রামী আলেমদের গৌরবোজ্জ্বল ও মহিমাদীপ্ত দুর্বার আন্দোলনের কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় এ আন্দোলনের কোন বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য ইতিহাস আজও রচিত হয়নি বলে লেখকের এ প্রাথমিক প্রচেষ্টা সীমিত হলেও প্রকৃতির দিক দিয়ে যেমন মৌলিক, তেমনি অবদানের দিক থেকে প্রথম সারির। বিষয় ও বিন্যাসের কোথাও কোথাও ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও, পুস্তিকাখানি ইসলামী জনতার দৃষ্টিপথে তাদের শ্রদ্ধাভাজন নায়েবে নবী ওলামায়ে কেরামের চিরন্তন সংগ্রামের একটি দিক তুলে ধরবে বলেই আমার বিশ্বাস।

ইতি-
মুহাম্মদ আবদুল রাজ্জাক
[প্রধান অধ্যক্ষ] রিসার্চ একাডেমী,
ফরিদাবাদ, ঢাকা- ৪
১০ ই জুলাই ১৯৭০ইং

অভিমত

[দুই]

আলেমগণ নবী রাসূলদের ওয়ারিছ বা উত্তরাধিকারী। এ উত্তরাধিকার বিষয়-সম্পদের নয় -আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধানকে পূর্ণাঙ্গ রূপে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠাকল্পে সংগ্রাম-সাধনা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, কষ্ট-পরিশ্রম ও নিঃস্বার্থ আন্দোলনের। নবী-রাসূলগণ যে ভাবে মানব-জাতিকে মানুষের গোলামী, জুলুম, নিপীড়ন, শোষন থেকে আজাদ করার জন্যে সংগ্রাম করেছেন, তাদেরকে আল্লাহ্র নিরপেক্ষ ইনসাফপূর্ণ আইন ও শাসন বিধান অনুসরণের আহবান জানিয়ে তাদের উভয় জাহানের মুক্তিপথ দেখিয়ে গেছেন, আলেমগণের এই উত্তরাধিকার দায়িত্বও একমাত্র এ পন্থায়ই সম্পাদিত হতে পারে। -এ ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় নয়। যুগে যুগে নবী-রাসূলদের খাঁটি ওয়ারিছ তথা উত্তরাধিকারীরা ঐ একই পন্থায়ই তাদের উক্ত ওরাছাতের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তাঁরা নিজেদের কার্যাবলী দ্বারা আজকের ন্যায় এমনভাবে সমাজের সামনে ইসলামকে তুলে ধরেননি যাতে মনে হতো, ইসলাম শুধু মসজিদ-মাদ্রাসা ও এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরই পালনীয় বিষয়, -মসজিদের ইমাম বা মাদ্রাসায় শিক্ষিতদের সাথে রাষ্ট্র, সমাজ, দেশরক্ষা, যুদ্ধক্ষেত্র ও শিল্প কারখানায় কর্মরত মেহ্নতী মানুষ, দেশগড়া ও জাতীয় সমস্যাবলীর নেই কোনো সম্পর্ক।

বলাবাহুল্য, মুসলিম সমাজে 'ওরাছাতুল আম্বিয়া" বা নবীদের উত্তরাধিকারীদের এই অনুভূতি যখনই আলেমদের মধ্য থেকে লোপ পায় এবং জনসাধারণ মেহরাব-মিম্বর থেকে নামাজ-রোজা কয়েকটি বিশেষ আনুষ্ঠানিক ইবাদতের ব্যাপারেই শুধু ইমামদের ইমামতী বা নেতৃত্ব পেলেও তাদের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পেটের সমস্যা, আবাসিক সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে কোরআন-নির্দেশিত সমাধানের ইমামতি বা নেতৃত্ব থেকে তারা বঞ্চিত হয়, তখনই মানুষ ঐ সকল ব্যাপারে শূন্যতা পূরণের খেয়ালে বিদেশী ও বিজাতীয় মতাদর্শের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের এই পথভ্রষ্টতার জন্যে মূলতঃ কারা দায়ী হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের সমাজ এই বিভ্রান্তিরই শিকার।

সুপরিচিত লেখক ও সাংবাদিক মওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী এই উপমহাদেশে যে সব মহান সংগ্রামী আলেম যথার্থ 'ওরাছাতুল আম্বিয়া' হিসাবে

নিজেদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন এবং স্বাধীন ও শোষণহীন ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েমের জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে গেছেন, তাদের সংগ্রামী জীবনের বিস্মৃত সেই দিকটিকে সামনে তুলে ধরেছেন। এর ফলে সংক্ষিপ্তাকারে হলেও ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আমাদের সামনে আসলো। ইসলামী আন্দোলনের সাথে সক্রিয় সংশ্লিষ্টতার কারণে লেখক নিজেও ইসলামের সংগ্রামী ভাবধারায় বিশ্বাসী। এ বইটির বিন্যাসে তার ছাপ সুস্পষ্ট। লেখকের এ বইটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এদেশের আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের আন্দোলন ও সংগ্রামকে তিনি মোগল পতন যুগে শাহ ওয়ালীউল্লাহর চিন্তাধারা থেকে নিয়ে দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকতার সঙ্গে পাঠক সমীপে তুলে ধরেছেন।

বইখানা সংক্ষিপ্ত হলেও একদিকে যেমন তা ঐতিহ্যবিস্মৃত এক শ্রেণীর ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিক ও আধুনিক শিক্ষিত যুবকের সামনে "আলেমরা এতদিন কোথায় ছিলেন?" –তার সন্ধান দেবে, তেমনি আজকের ইসলামী আন্দোলনের সংগ্রামী তরুণ সমাজ, বিশেষ করে ওলামা ও মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে নিজেদের ঐতিহ্য চেতনায় করে তুলবে উজ্জীবিত। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখিত এ বইটির আমি বহুল প্রচার কামনা করি।

–আবদুল মান্নান তালিব
বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও
সম্পাদক–মাসিক পৃথিবী ঢাকা
তাং ১/৭/৭০ইং

প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

একটি জাতির জীবনে অতীতের কীর্তি-কলাপ, শৌর্যবীর্য তার অগ্রগতির পথে আলোর দিশারীরূপে কাজ করে। জাতির আত্ম-প্রতিষ্ঠার সাধনা ও সংগ্রামে অতীত দিনের স্মৃতি যোগায় প্রেরণা। নিজেদের সংগ্রামী অতীতকে চেনা ও জানার জন্য তাই জাতীয় জীবনে ইতিহাসের গুরুত্ব অপরিসীম। যে জাতি নিজ ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ, তাকে পদে পদেই হতে হয় পরাশ্রয়ী। বিজাতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাবধারার শিকারে পরিণত হয়ে ডোর-কাটা ঘুড়ির মতোই মহাশূন্যে ঘুরপাক খেতে হয় তাকে। উপমহাদেশের আজাদী আন্দোলনের ইতিহাস এই ভূ-খণ্ডের মুসলমানদের একটি গৌরবময় সংগ্রামী ইতিহাস। তৎকালীন মুসলিম শিক্ষিত ব্যক্তি তথা আলেম সমাজই এ আন্দোলনের সূচনা করেন এবং পুরোভাগে থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এককভাবে এর নেতৃত্ব দেন। তারপরও উপমহাদেশে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাতে সক্রিয়ভাবে তাঁরা জড়িত থাকেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এক শ্রেণীর লোক নানানভাবে আমাদের বংশধরদেরকে সেই গৌরবময় ইতিহাস থেকে অন্ধকারে রাখতে চায়।

উপমহাদেশের আজাদী আন্দোলনে এই ভূ-খণ্ডের আলেম সমাজের কি ভূমিকা ছিল, এটা নিয়ে দেশ বিভাগের দীর্ঘ দিন পর কিছু লিখতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে যে, সত্যি কি ব্যাপারটি এমন যে, এ নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করে এটা প্রমাণ করতে হবে? কেননা যে বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট, সেটি কাউকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য হেজাক লাইটের ব্যাবস্থা করা বা কারুর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার দরকার হয় না। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, তাই করতে হচ্ছে। ১৯৪৭ সালের পর থেকে আমাদের শাসকগোষ্ঠী বিশেষ করে পাকিস্তানের কর্ণধারগণ দেশকে সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল দিক থেকে এমন চরম বিভ্রান্তির পথে নিয়ে গিয়েছেন, যার ফলে মুসলিম যুবকদের মনে একথা বদ্ধমূল থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় যে, অবিভক্ত ভারতের আলেমগণই ছিলেন উপমহাদেশের মুক্তি-আন্দোলনের পুরোধা, তাঁরাই প্রথমে মুসলমানদের যাবতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী করতে গিয়ে ইংরেজ শাসকদের হাতে অকথ্য জুলুম-নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলেন, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলেছিলেন, দ্বীপান্তরে হয়েছিলেন নির্বাসিত। তাঁরাই আঘাতের পর আঘাত খেয়েও সফলতার দুর্জয় আকাংখা নিয়ে ইংরেজদের

বিরুদ্ধে বারংবার অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। আর এমনিভাবে উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে অক্ষুন্ন রেখেছিলেন ইসলামী প্রেরণা, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিবোধ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালের মূল প্রতিশ্রুতি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার কথা বিস্মৃত হয়ে যাওয়ায় দেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাংবাদিকতা-প্রচার মাধ্যম যাবতীয় বাহনের বদৌলতে এমন সব যুবকও সৃষ্টি হয়েছে, যারা আজ ক্ষেত্র বিশেষে স্পষ্টরূপে একথা বলতে দ্বিধা করে না যে, আলেম সমাজই আমাদের সর্বনাশের মূল-এ সমাজের জন্য আলেমদের কোন দান নেই। শুধু তারাই নয়, যেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পটভূমি একমাত্র আলেমদের একক সংগ্রামে রচিত হয়েছিল, এমন কি এর সৃষ্টিতেও অন্যান্য জাতীয় নেতৃবন্দের সাথে যে সব আলেমের বিরাট অবদান রয়েছে, সেই দেশের শাসন-মসনদে সমাসীন বিলাস জীবন উপভোগকারী কোন কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে পর্যন্ত নির্লজ্জের মতো আলেমদের সমালোচনা করতে দেখা যায়। যদিও শত চিৎকার সত্ত্বেও জাতির নিঃস্বার্থ সেবক আলেমদের জীবন-মান উন্নত করার ব্যাপারে তাদের কোনোরূপ মাথা ঘামাতে দেখা যায়নি।

একটি ষড়যন্ত্র

আজ প্রায় আড়াই যুগ পরেও [১৯৭০ইং] ঐ সকল সংগ্রামী আলেমের জীবনী সহ আমাদের জাতীয় ইতিহাস রচিত হতে পারলোনা কেন? হবে কিনা বলার উপায় নেই। কিন্তু আজ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রনায়ক ও এর পটভূমি রচনাকারী হিসাবে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যপুস্তকে ও পত্র-পত্রিকায় যে সকল ব্যক্তিত্বের জীবনালেখ্য খুটিনাটি বিষয় সহ বিস্তারিত আলোচিত হয়ে থাকে, তন্মধ্যে গুটি কয়েক আলেম ছাড়া অধিকাংশের ব্যাপারে সরকারী পর্যায়ে কেন উপযুক্ত বই-পুস্তক রচিত ও ব্যাপকভাবে তাদের অবস্থা সম্পর্কে চর্চা হলো না? এটা কি কোন ষড়যন্ত্রের ফল? অবিভক্ত ভারতের নিগৃহীত ও নির্যাতিত মুসলমানদের মুক্তির-দিশারী এ সকল ওলামায়ে কেরামের সংগ্রামী জীবন আমাদের যুব-সমাজের সামনে যথাযথ বিদ্যমান থাকলে কিছুতেই আজ এ রূপ প্রশ্ন দেখা দিতে পারতো না, যার ফলে আলেম সমাজের একটি বিরাট অংশও আজ নিজেদের অগ্রপথিকদের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হতো না এবং এদেশ সম্পূর্ণরূপে নিছক বস্তুবাদী শিক্ষিতদের খপ্পরে পড়ে বর্তমানের ন্যায় সামাজিক ও রাজনৈতিক অশান্তি দেখা দিতনা। জাতিকেও আদর্শিক সংঘাতের সম্মুখীন হতে হতো না। স্মরণ রাখা দরকার যে, জাতির শ্রদ্ধেয় পূর্বসুরীদের প্রতি এই অবজ্ঞত পারে।

সব চাইতে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, মুক্তি-সংগ্রামের অগ্রনায়কদের মধ্যেও নিদেন পক্ষে যে কয়েকজন আলেমের নাম ভারত-বিভাগের পর বিশেষভাবে আলোচিত হতে দেখা গেছে, তাদের সম্পর্কে কলম ধরতেও আমাদের আধুনিক লেখকগণ তেমন উদারতার পরিচয় দিতে পারছেন না। উপমহাদেশে মুসলমানদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সার্বিক স্বার্থরক্ষার জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম সংগ্রামী নেতা মরহুম মওলানা শাববীর আহমদ ওসমানী সম্পর্কেতো কিছু লেখা হয় না বল্লেই চলে, এমনকি উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃত শহীদে বালাকোট সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভী ও তাঁর ত্যাগী সংগিসাথীদের সম্পর্কে লিখতে গিয়েও যেন তাদের কলম এগুতে চায় না। তাঁরই শিষ্য বাংলার শহীদ তিতুমীর অর্থাৎ মওলানা হাজী নেছার আলী যে 'মওলানা' ছিলেন এবং তদানীন্তন কালের ইসলামী আন্দোলনের নেতা সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভীর আন্দোলনের একজন ত্যাগী মোজাহেদ ছিলেন, তাঁর এই পরিচয়টি দিতে তাঁরা কার্পণ্য দেখান। অথচ বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের এই আলেম নেতা বাংলার মুসলমানদের নিয়ে একমাত্র ইসলামের খাতিরে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইংরেজদের সঙ্গে বীরের ন্যায় সংগ্রাম করে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তাঁর সংগ্রামী জীবনকে আমাদের সামনে যেভাবে তুলে ধরা হয়, তাতে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ, আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী এ যুগের কোনো নেতার ছবিই ভেসে ওঠে। এথেকে এটাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এদেশে এক শ্রেণীর লোকের দ্বারা আমাদের আজাদী সংগ্রামের ইতিহাসকে বিকৃত করার একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র সক্রিয়। এই মহলটি ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধকে নষ্ট করার জন্যে যেভাবে অক্লান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছে, তেমনিভাবে ভবিষ্যত বংশধর বিশেষ করে ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী যুবকবৃন্দ বিশেষ করে আলেম সমাজও যাতে তাদের সংগ্রামী পূর্বপুরুষদের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকে, সেই চেষ্টায় তারা নিয়োজিত। অন্যথায় এর কি যুক্তি থাকতে পারে যে, এ পথের সামান্যতম দানও যাদের রয়েছে, তাদের জীবন কাহিনীও তারা যেখানে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় লিখতে পারেন, সেক্ষেত্রে উপমহাদেশের আজাদী আন্দোলনের পটভূমি রচনাকারী ও মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী বিশিষ্ট আলেম নেতাগণ তাদের লেখায় স্থান পান না?

এই লুকু চুরির মতলব যদি হয় ধর্মনিরপেক্ষতা চালু করা, এর খেসারত সুদূর ভবিষ্যতে একদিন নিজেদেরকেতো দিতে হবেই- গোটা দেশবাসীকেও দিতে হবে।

সব চাইতে অধিক দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এপথের সর্বস্বীকৃত নেতাদেরকে আজ বিকৃতভাবে আধুনিক তরুণদের সামনে পেশ করার আত্মঘাতি

প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। একথা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, পঞ্চাশের দশকের টেক্সট বুক বোর্ডের একটি ইতিহাস পুস্তকে উপমহাদেশের মুসলমানদের জাতীয় চেতনার উৎস সাইয়েদ আহ্মদ শহীদ বেরলভী সম্পর্কে এই নির্লজ্জ ও বিকৃত তথ্য পরিবেশন করা হয় যে, তিনি নাকি "সীমান্তবর্তী শিখদিগকে বিব্রত রাখিয়া ইংরেজদের অধিকারকে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন।" শুধু তাই নয়, তাঁর মোজাহেদ বাহিনীর সদস্যগণ নাকি "লুটতরাজ (দস্যুবৃত্তি) করে মুক্তিযোদ্ধাদের রসদ সংগ্রহ করিতেন।" এছাড়া তাঁর সংগঠন নাকি ছিলো- "শান্তিভঙ্গকারী দল।"এ থেকে কি এটাই প্রতীয়মান হয়না যে, পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠির অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থায় শুরু থেকেই ইসলাম বিরোধী ইঁদুরেরা জেঁকে বসেছিল, যারা তলে তলে সুকৌশলে ইসলাম বিরোধী শিষ্য এ দেশে তৈরীতে নিয়োজিত ছিল।

উক্ত আন্দোলনে বাংলাদেশ থেকে যে সকল মুক্তিযোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের নিয়ে আজ আমরা এতদিন যেখানে দলমত নির্বিশেষে সকলে গর্ব করে আসছি এবং এই গোটা বালাকোর্ট আন্দোলনও এসব সংগ্রামী মোজাহেদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ৪৭-এর আজাদী আন্দোলন করেছি এবং এখনও যাবতীয় অন্যায় ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি, তাদের সম্পর্কে যদি দেশের অগণিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ লক্ষ ছাত্রকে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা দেয়া হয়, তাহলে একে শুধু নিজস্ব ইতিহাসই নয় দস্তুর মতো এদেশ ও জাতির বিরুদ্ধে গোষ্ঠী বিশেষের ষড়যন্ত্র বলা ছাড়া উপায় থাকে কি?

শুধু তাই নয়, টেক্সট বুক বোর্ডের উক্ত পুস্তকটির অপর এক স্থানে ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত মহামনীষী দার্শনিক ইমাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীকেও কটাক্ষ করতে বাদ দেয়া হয়নি। পুস্তকটিতে তাঁর সম্পর্কে এভাবে মন্তব্য করা হয় যে, "আহ্মদ শাহ্ আবদালীর দিল্লী আক্রমণের পিছনে তৎকালীন মুসলিম ধর্মীয় নেতা শাহ্ ওয়ালি-উল্লাহর আমন্ত্রণই কার্যত দায়ী। তিনি মারাঠা ও শিখ প্রাধান্য সহ্য করিতে পারিতেন না।" অথচ একথা ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই জানার কথা যে, গাজী আবদালী ঐ সময় মুসলমানদের জীবন মরণ সন্ধিক্ষণে তাদেরকে শিখ-মারাঠাদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যেই এসেছিলেন এবং ঐতিহাসিক পানিপথের সর্বশেষ যুদ্ধে মারাঠা শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে মুসলমানদেরকে বিজয়ের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। শাহ্ সাহেবের অভিপ্রায়ে যেই মুহূর্তে মোগল প্রশাসনের আমীরুলউমারা নজীবুদ্দৌলা আবদালীকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন, সে সময় শিখ-মারাঠাদের তরবারীর আঘাতে মুসলমানরা খান খান হচ্ছিল, তাদের জানমালের ছিলনা কোনো নিরাপত্তা। তাছাড়া

মহাপ্রাণ আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী যে ক্ষমতার লিপ্সা নিয়ে যে এ ডাকে সাড়া দেননি তার বড় প্রমান হলো, যুদ্ধজয়ের পর পরই দিল্লীর শাসকদের হাতে তিনি ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

যা হোক, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম বিরোধী ছদ্মবেশী বুদ্ধিজীবিকদের এ সব অশুভ তৎপরতা লক্ষ্য করেই দীর্ঘ দিন থেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত লেখার কথা চিন্তা করে আসছি। কিন্তু তার পূর্বেই সংক্ষিপ্তাকারে উপমহাদেশের আলেমদের সম্পর্কে একখানা ছোট বইয়ের মাধ্যমে তাদের সমাজের সামনে তুলে ধরার জন্যে কিছু সমাজ দরদী সুধীর পক্ষ থেকে তাগিদ আসে। বইখানা সংক্ষিপ্ত হলেও উপমহাদেশে ইসলামী রেনেসাঁ থেকে ৪৭-এ স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এতে আলেমদের তৎপরতার একটি যোগসূত্র সুস্পষ্টরূপে পাঠক সমীপে ফুটে উঠবে। আশা করি, এ বইখানা দ্বারা সমাজের বিশেষ করে নানান বিভ্রান্তির শিকারে নিপতিত এক শ্রেণীর যুবকদের মনে আলেম সমাজের অতীত সংক্রান্ত বিভ্রান্তির অপনোদন ঘটবে। এদ্বারা আজাদী ও ইসলামী আন্দোলনের সংগ্রামী মোজাহিদদের ত্যাগী জীবনের কিছুমাত্র যদি নতুন বংশধরদের জীবনে রেখাপাত করে এবং বিভ্রান্তির বেড়াজাল মুক্ত হয়ে দেশে একটি জনকল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা ইসলামী আন্দোলনকে সাফল্য মণ্ডিত করতে এগিয়ে আসেন, তা হলে নিজের পরিশ্রম কিছুটা হলেও স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

—লেখক

سورة الفاتحة
بسم الله الرحمن الرحيم ١
الحمد لله رب العٰلمين ٢ الرحمٰن
الرحيم ٣ مٰلك يوم الدين ٤
إياك نعبد وإياك نستعين ٥
اهدنا الصرٰط المستقيم ٦ صرٰط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين ٧

প্রাক-ইংরেজ আমলের ভারত

আজাদী আন্দোলনের সূচনা সম্পর্কিত আলোচনায় স্বাভাবিক ভাবেই গোলামীর যুগ ও তার পটভূমি সম্পর্কে একটি জিজ্ঞাসা জাগে। এ জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে গিয়ে ইতিহাস থেকে আমরা এটাই জানতে পারি যে, তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত-ভিত্তিক ইসলামী জীবনধারা থেকে বিচ্যুতির ফলে যেমন পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে মুসলমানরা দুর্বল ও বিদেশী দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হয়েছিল, তেমনি হিমালয়ান উপমহাদেশেও তারা মোগলপতন যুগে প্রথমে শিখ-মারাঠা কর্তৃক বিপর্যস্ত ও পরে ইংরেজদের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেবের পর থেকেই উপমহাদেশের মুসলমানদের শাসন ক্ষমতায় পতনের সূচনা ঘটে। আওরঙ্গজেবের তিরোধানের পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যারা দিল্লীর মসনদে আসীন হয়েছিলেন, তাদের বেশীর ভাগই ছিলেন অযোগ্য ও দুর্বল শাসক। ধর্মীয়, চিন্তাগত, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বন্ধ্যাত্ব এবং পতন দেখা দিয়েছিলো তা রোধ করার মতো ক্ষমতা তাদের মোটেই ছিল না।" কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকগণ নিজেদেরকে নামেমাত্র দিল্লীর অধীন বলে প্রকাশ করলেও কার্যতঃ ঐসব আঞ্চলিক শাসক স্বাধীন শাসনকর্তা হিসাবেই সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহ শাসন করতেন।

উপমহাদেশের মুসলিম শাসন ক্ষমতার এ দুর্বলতা লক্ষ্য করেই বণিক হিসাবে আগত ইংরেজরা এদেশের শাসক হবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। পরিণামে, ঘরের ইঁদুরদের কারণে পলাশীযুদ্ধে ইংরেজদের হাতে মুসলমানদের বিপর্যয় ঘটে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসক নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রে ইংরেজরা পরাজিত ও হত্যা করে। এভাবে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে বাংলা দখল করার মধ্য দিয়েই ইংরেজদের সেই স্বপ্নসাধ পূর্ণ হতে থাকলো। পলাশী যুদ্ধের পর দিল্লী কেন্দ্রকে লক্ষ্যস্থল স্থির করে তারা ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলো। একের পর এক কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন মুসলিম অমুসলিম শাসকদের স্বাধীন রাজ্যগুলোকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করলো।

১৭৯৯ খৃঃ শাহ্ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর চিন্তায় উদ্বুদ্ধ এবং ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতাযুদ্ধে নিবেদিতপ্রাণ মহীশূরের বীর সুলতান টিপুকে ইংরেজরা পরাজিত ও হত্যা করলো। সর্বশেষে সম্রাট শাহ্ আলমকে জায়গীর হিসাবে লাল কেল্লা ছেড়ে দিয়ে ১৮০৫ খৃঃ দিল্লী হস্তগত করে ইংরেজরা সমগ্র ভারতে নিজেদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করলো।

কয়েকটি জিজ্ঞাসা

ইতিহাসের কোন ঘটনাই সম্পর্কহীন নয়। কার্যকারণ পরম্পরার ফলেই ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্রপাত হয়। বস্তুতঃ এ কারণেই দেখা যায়, বাংলা পাক-ভারত উপমহাদেশের আজাদী আন্দোলনের সাথে ১৭৫৭, ১৮৫৭ এবং ১৯৪৭ সালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পরস্পর ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেবের প্রথম উত্তরাধিকারীদের যুগ থেকে এ জাতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দিনের পর দিন যেভাবে ক্রমাবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ১৭৫৭ সালে পলাশীর বিয়োগান্ত ঘটনা তাদের জন্য প্রথম বাস্তব ও বেদনাদায়ক আঘাত হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলো। তার পরবর্তী কালে ১৮৫৭ ও ১৯৪৭ সালের ঘটনাদ্বয় ছিল উপমহাদেশে মুসলিম পুনর্জাগরণের বাস্তব ফলশ্রুতি।

কিন্তু এই পুনর্জাগরণ কার চিন্তার ফসল ছিল? উপমহাদেশে ইসলামী রেনেসাঁর বীজ মুসলমানদের চিন্তা ও মগজে কে বপন করেন? হতোদ্যম পরাজিত মুসলিম জাতি এ চেতনা ও অনুপ্রেরণা কোত্থেকে পেয়েছিলো, যদ্দরুন ১৮৫৭ সালে উপমহাদেশের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ইংরেজ রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে তারা প্রকাশ্যে রুখে দাঁড়িয়েছিল? তার পূর্বে ১৮৩১ সালে কোন্ অনুপ্রেরণা তাদের বালাকোটের রণাঙ্গনে ছুটে যেতে পাগল করে তুলেছিলো এবং কোন্ যাদুপ্রেরণা এই রণক্লান্ত ভগ্নহৃদয়ের মুসলমানদেরকে পুনরায় বলবীর্য ও শক্তি-সাহসে উজ্জীবিত করে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সালের শেষ বিজয়ের আগ পর্যন্ত সংগ্রামে অটল রেখেছিলো? –এ সব বিষয় আজ ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা ও তরুণ সমাজের কাছে তুলে ধরার সময় এসেছে। সময় এসেছে অবিভক্ত ভারতকে দ্বিখন্ডিত করে মুসলমানরা কোন্ দুঃখে উপমহাদেশে নিজেদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বাধ্য হয়েছিল। যার একাংশ পরে স্বাধীন বাংলাদেশ রূপে গঠিত হয়। এজন্যে সৃষ্ট আন্দোলনের সঠিক পটভূমি জাতির সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরা এবং এরই আলোকে সেই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে ভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করা একান্ত প্রয়োজন।

অবিভক্ত ভারতের সর্বত্র নিরাশার কালছায়া নেমে এলো : আলেমগণই আজাদী আন্দোলনে এগিয়ে এলেন

কোনো সফলতাই ত্যাগ, শ্রমসাধনা ও সংগ্রাম ছাড়া আসে না। বিশেষ করে জাতীয় জীবনের সফলতার ক্ষেত্রেতো কোনো অবস্থাতেই নয়। তেমনিভাবে ১৯৪৭ সালে পাক-ভারত উপমহাদেশের আজাদীও বিচ্ছিন্ন কোনো আন্দোলনের ফলে আসেনি। তার পেছনে রয়েছে এক সুদীর্ঘ ত্যাগ ও রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস। সেই ত্যাগ-সংগ্রামই ধীরে ধীরে গোটা অবিভক্ত ভারতের আজাদীর পথকে প্রশস্ত করেছিলো। আর পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, সেই সংগ্রামের পুরোভাগে ছিলেন তৎকালীন মুসলিম সমাজের শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ আলেম সমাজই।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা দিল্লীর শাসক সম্রাট শাহ আলমকে লাল-কেল্লা, এলাহাবাদ ও গাজীপুরের জায়গীর ছেড়ে দেয়। কিন্তু উপমহাদেশে মুসলিম শাসন ক্ষমতার শেষবিন্দুটি পর্যন্ত মুছে দেয়ার পূর্বেই ইংরেজগণ সমগ্র ভারতে নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল। সারা দেশে আলেম ও গায়ের আলেম সুধী সমাজের মধ্যে 'প্রকাশ্যে এ ঘোষণা দেয়ার সাহস এমন কারও ছিল না যে,- বিদেশীর শাসনাধীন ভারত হচ্ছে 'দারুল হরব' যেখানে জেহাদ করা প্রতিটি খাঁটি মুসলমানের কর্তব্য। সর্বত্র নৈরাশ্যের কাল ছায়া ঘনীভূত হয়ে এসেছিলো। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন সকল শ্রেণীর মুসলমান। ইংরেজগণ উপমহাদেশে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে দৃঢ়তর করার জন্য এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা- সভ্যতা, ধ্যান-ধারণা, কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রসার দান ও এদেশের এতিহ্যবাহী শাসকজাতি মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্যমুখী ও হীনমনা করে গড়ে তোলার জন্যে গভীর পরিকল্পনায় নিয়োজিত ছিলো। তারা অমুসলিম এবং মুসলমানদের থেকেও কিছু সংখ্যক লোককে ইতিমধ্যেই হাত করে নিয়েছিল। মুসলমান জাতির জন্যে ঐ সময়টি ছিল এক কঠিন পরীক্ষার ।

মওলানা শাহ আবদুল আজীজের বিপ্লবী ফতওয়া

ঠিক এ সময়ই 'ওয়ালিউল্লাহ আন্দোলনে'র প্রধান নেতা ও তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ আবদুল আজীজ দেহলভী এক বিপ্লবী ফতওয়া প্রচার করে এই হতোদ্যম জাতিকে পথের সন্ধান দেন এবং তাদেরকে ইসলামের জেহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হবার আহবান জানান। শাহ আবদুল আজীজ তাঁর পিতা মহামনীষী ও ইসলামী রেনেসাঁর উদগাতা

হযরত শাহ ওয়ালী-উল্লাহ দেহলভীর তিরোধানের পর (১৭৬৭ খৃঃ) থেকে দিল্লীর রহিমিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ওয়ালীউল্লাহ চিন্তাধারার প্রচার, জনসংগঠন প্রভৃতির মাধ্যমে "তারীবে মুহাম্মদী" নামে ইসলামী পুনর্জাগরণের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এই নির্ভীক মোজাহিদ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ফতোয়ার মাধ্যমে ঘোষণা করলেন যে,–

"এখানে (ভারতে) অবাধে খৃষ্টান অফিসারদের শাসন চলছে, আর তাদের শাসন চলার অর্থই হলো,– তারা দেশরক্ষা, জননিয়ন্ত্রণ বিধি, রাজস্ব, খেরাজ, ট্যাক্স, ওশর, ব্যবসায়পণ্য, চোর-ডাকাত-দমনবিধি, মোকদ্দমার বিচার, অপরাধমূলক সাজা প্রভৃতিতে (যেমন– সিভিল, ফৌজ, পুলিশ বিভাগ, দীওয়ানী ও ফৌজদারী, কাস্টমস ডিউটি ইত্যাদিতে) নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। এ সকল ব্যাপারে ভারতীয়দের কোনই অধিকার নেই। অবশ্য এটা ঠিক যে, জুমার নামাজ, ঈদের নামাজ, আজান, গরু জবাই– এসব ক্ষেত্রে ইসলামের কতিপয় বিধানে তারা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে না। কিন্তু এগুলোতো হচ্ছে শাখা-প্রশাখা; যে সব বিষয় উল্লিখিত বিষয়সমূহ এবং স্বাধীনতার মূল (যেমন- মানবাধিকার, বাকস্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার) তার প্রত্যেকটিই ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং পদদলিত করা হয়েছে। মসজিদসমূহ বেপরোয়াভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে, জনগণের নাগরিক স্বাধীনতা খতম করে দেয়া হয়েছে। এমন কি মুসলমান হোক কি হিন্দু-পাস-পোর্ট ও পারমিট ব্যতীত কাউকে শহরে প্রবেশের সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। সাধারণ প্রবাসী ও ব্যবসায়ীদেরকে শহরে আসা-যাওয়ার অনুমতি দানও দেশের স্বার্থে কিংবা জনগনের নাগরিক অধিকারের ভিত্তিতে না দিয়ে নিজেদের স্বার্থেই দেওয়া হচ্ছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেমন সুজাউল-মুলক, বেলায়েতী বেগম প্রমুখ ইংরেজদের অনুমতি ছাড়া বাইর থেকে প্রবেশ করতে পারছেন না। দিল্লী থেকে কলকাতা পর্যন্ত তাদেরই আমলদারী চলছে। অবশ্য হায়দ্রাবাদ, লক্ষ্নৌ ও রামপুরের শাসনকর্তাগণ ইংরেজদের আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়ায় সরাসরি নাছারাদের আইন সেখানে চালু নেই। কিন্তু এতেও গোটা দেশের উপরই 'দারুল হরবের-ই হুকুম বর্তায়।" –ফতওয়ায়ে আজীজী (ফারসী), ১৭ পৃঃ মুজতাবীয়া প্রেস।

এ ভাবে শাহ্ আবদুল আজীজ দেহ্লভী অন্য একটি ফতওয়ার মাধ্যমে ভারতকে 'দারুল হরব' "শত্রুদেশ" বলে ঘোষণা করেন। ফতওয়ার ভাষায় 'দারুল হরব' পরিভাষা ব্যবহারের মূল লক্ষ্য ছিলো রাজনৈতিক ও স্বাধীন সংগ্রামের আলো প্রজ্জ্বলিত করা। যার সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে,– "আইন রচনার যাবতীয় ক্ষমতা খৃষ্টানদের হাতে, তারা ধর্মীয় মূল্যবোধকে হরণ করেছে। কাজেই প্রতিটি দেশপ্রেমিকের কর্তব্য হলো বিদেশী ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে এখন থেকে নানানভাবে সংগ্রাম করা এবং লক্ষ্য অর্জনের আগ পর্যন্ত এই সংগ্রাম অব্যাহত রাখা।"

ইংরেজ বিরোধী ফতওয়ার প্রতিক্রিয়া

সাধারণ মুসলমানগণ এযাবত ইংরেজদের ক্ষমতা ও প্রতাপের সামনে নিজেদেরকে অসহায় মনে করতেন এবং নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন। এ ফতওয়া প্রকাশের পরই মুসলমানরা কর্মনীতি নির্ধারণের পথ খুঁজে পায়। শাহ্ আবদুল আজীজ দেহ্লভীর আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কর্মী ও তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রবৃন্দের দ্বারা উপমহাদেশের সকল শ্রেণীর মুসলমানের নিকট এই বিপ্লবী ফতোয়ার বাণী প্রচারিত হয়। আর এমনিভাবে মুসলমানদের মনে ক্রমে ক্রমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদী ভাব জাগ্রত হতে থাকে।

পরবর্তীকালে দেখা যায়, শাহ্ আবদুল আজিজেরই শিষ্য সাইয়েদ আহমদ শহীদের নেতৃত্বে এবং তাঁর জামাতা মওলানা আবদুল হাই ও ভ্রাতুষ্পুত্র মওলানা ইসমাইল শহীদের সেনাপতিত্বে (আনুঃ ১৮১৭ খৃঃ) বিরাট মোজাহেদ বাহিনী গঠিত হয়। এই মোজাহেদ বাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য ছিলো খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী (শিখ ও ইংরেজ) দের বিরুদ্ধে জেহাদ করা। তাঁরা এ উদ্দেশ্যে পূর্ব-ভারত কিংবা দক্ষিণ অথবা উত্তর ভারতে কোন স্থানকে নিরাপদ মনে না করে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পেশোয়ার-কাশ্মীর এলাকায় নিজেদের কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের এ আন্দোলন ও সংগ্রামে উপমহাদেশের পূর্ব সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহ, (কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, মোমেনশাহ্ প্রভৃতি) থেকেও মুসলমানরা যোগদান করেছিল।

বাংলাদেশে সাড়া জাগলো

শাহ্ আবদুল আজীজের এই ইসলামী আন্দোলন ও উক্ত ফতওয়ার প্রভাবে বাংলাদেশেও বিপুল সাড়া জেগেছিলো। যার ফলে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এখানে ফরিদপুরের হাজী শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলনের নামে এক শক্তিশালী ইসলামী আন্দোলন গড়ে ওঠে। তার সামান্য কিছুদিন পরেই মোজাহেদ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বাংলার মওলানা তীতুমীর (হাজী সাইয়েদ নেসার আলী) ও তাঁর সঙ্গীরা এখানে বহু স্থানে ইংরেজদের সংঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। মওলানা তিতুমীর ছিলেন 'শহীদে বালাকোট' সাইয়েদ আহমদ শহীদের একনিষ্ঠ শিষ্য। তিনি ১৮৩১ খৃঃ সাইয়েদ সাহেব যে সালে বালাকোটে শাহাদাত বরণ করেন ঐ সালেই ইংরেজ দোসরদের সঙ্গে জেহাদে শহীদ হন।

ফরায়েজী আন্দোলনের শেষের দিকে মওলানা কারামত আলী জৈনপুরীও সাইয়েদ আহমহ শহীদের শিষ্য হিসাবে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আদর্শ প্রচারে বিরাট কাজ করেন। বাংলা দেশে মুসলমানদের জীবন থেকে হিন্দুয়ানী তথা বিজাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব দূরীকরণ ও এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ইসলাম প্রচারের

ব্যাপারে মওলানা কারামত আলী জৈনপুরীর অসামান্য দান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মূলতঃ এ কারণেই এখনও বাংলার প্রতিটি মানুষ "হাদিয়ে বাঙ্গাল" মওলানা কারামত আলী জৈনপুরীকে অতি ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করে।

সাইয়েদ আহমদ বেরলভীর আন্দোলন

মোহাজেদ বাহিনীর নেতা সাইয়েদ আহমদ শহীদ জেহাদের উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে তাঁর শত শত কর্মীকে নিয়ে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে পবিত্র হজ্জ পালনের লক্ষ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বদেশে ফিরে তিনি ইসলামী আন্দোলনকে লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যে জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তাঁর দলের প্রতিটি মোজাহিদকে তিনি ইসলামের সোনালী যুগের আন্দোলনের কর্মী সাহাবীদের আদর্শে গঠন করতে চেষ্টা করেন। তাদের রাত্রদিনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিলো ভোরে প্রচারকার্য, দিবা ভাগে দৈনিক কঠোর পরিশ্রম, রাত্রির একাংশে তাহাজ্জুদ ও ইবাদতে জাগরণ–এসব ছিলো এই খোদাভক্তদের দৈনন্দিন সাধারণ কর্মসূচী। ইসলামের খাঁটি গণতান্ত্রিক নিয়মে তারা মসজিদ চত্বরে মেঝের সকলে সম্মিলিতভাবে খানাপিনা করতেন।

প্রস্তুতি পর্বে সাইয়েদ সাহেব দেশের প্রভাবশালী মুসলমানদের সাথেও যোগাযোগ করেন। নবাব সোলায়মান জা'কে লিখিত তাঁর একটি পত্র পাওয়া যায়। ঐ পত্র থেকে তাঁর আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। পত্রটি হলো– "আমাদের দুর্ভাগ্য, হিন্দুস্থান কিছুকাল হয় খৃষ্টানদের শাসনে এসেছে এবং তারা মুসলমানদের উপর ব্যাপকভাবে জুলুম নিপীড়ন শুরু করেছে। বেদআ'তে দেশ ছেয়ে গেছে এবং ইসলামী আচার-আচরণ ও চালচলন প্রায় উঠে যাচ্ছে। এসব দেখে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। আমি জেহাদ অথবা হিজরত করতে মনস্থির করেছি।"

সাইয়েদ আহমদের নেতৃত্বে মুক্তি সেনারা এগিয়ে চল্লো

সাইয়েদ আহমদ বেরলভী বেশ হৃদয়ঙ্গম করছিলেন এবং বারবার প্রচার করছিলেন যে, প্রকৃত মুসলিম সমাজ সংগঠন করতে হলে শক্তি ও রাজ্য প্রতিষ্ঠার দরকার। তিনি এই উদ্দেশ্যে সীমান্তে কাজ শুরু করেন যে, আন্দোলনের কেন্দ্র স্থাপন করতে হলে শত্রু থেকে দূরে একটি স্বাধীন এলাকার দরকার। তাছাড়া তিনি ভেবেছিলেন, সীমান্তের যুদ্ধপ্রিয় গোত্রগুলো তাঁর সহায়ক হবে।

এভাবে অবিভক্ত ভারতের সর্বত্র জেহাদের প্রস্তুতি ও প্রচারণা শেষ করে সাইয়েদ

আহমদ ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে রায়বেরিলী ত্যাগ করেন। সাইয়েদ সাহেবের সঙ্গে এ সময় মোজাহিদের সংখ্যা ছিলো ১২ হাজার; অল্প দিনের মধ্যেই তা এক লক্ষে উন্নীত হয়। তারা গজনী কাবুল ও পেশোয়ারের পথে নওশেরায় হাজির হলে পর শিখদের সাথে সংঘর্ষ বাধে। উল্লেখ্য, শিখগণ ঐ সময় রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে আধিপত্য বিস্তার করে মুসলমানদের উপর অকথ্য জুলুম অত্যাচার চালাচ্ছিল। এ অত্যাচারের পেছনে ইংরেজদেরও উস্কানি ছিলো। যা হোক, উক্ত সংঘর্ষে মাত্র ৯ শত মোজাহিদের সাথে বিপুল সংখ্যক শিখ সৈন্য পরাজয় বরণ করলো। সারা সীমান্ত প্রদেশ মুজাহিদদের প্রশংসা মুখর হয়ে উঠলো। কিছুদিন পর শের সিংহ ও জনৈক ফরাসী জেনারেলের অধীন প্রায় তিরিশ হাজার শিখ সৈন্য পুনরায় মুজাহিদদের মোকাবেলা করতে আসে। কিন্তু মুজাহিদ বাহিনী এগিয়ে আসলে শিখরা পনজতারে পিছু হটে যায় এবং সেখান থেকে খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। মুজাহিদদের এই বিরাট সাফল্য জনগণের উপর মস্তবড় প্রভাব বিস্তার করে।

পেশোয়ার অধিকার

পেশোয়ারবাসী সাইয়েদ আহমদকে সামগ্রিকভাবে শিখদের উপর হামলা করতে আহ্বান জানায়। ঐ সময় গরহিমাজির দশ হাজার যুদ্ধপ্রিয় লোক সরওয়ার তাঁর অধীন সাইয়েদ সাহেবকে ইমাম হিসাবে গ্রহণ করে। মোজাহিদদের সংখ্যা তখন সর্বমোট এক লক্ষে উপনীত হয়। এদিকে রণজিৎ সিংহ কতিপয় মুসলিম সরদারকে হাত করার জন্যে মুক্ত হস্তে অর্থ বিলি শুরু করলো এবং আরো নানাভাবে তাদের প্রলুব্ধ করার চেষ্টা চালালো। শেষ পর্যন্ত মোজাহিদ বাহিনীকে তিনটি শক্তির মোকাবেলা করতে হলো-শিখ, পেশোয়ারের বিশ্বাসঘাতক সর্দারবৃন্দ এবং খুবী খাঁ। বালাকোটের লড়াইর আগ পর্যন্ত শিখদের সাথে কয়েকটি সংঘর্ষেই সাইয়েদ আহমদকে লিপ্ত হতে হয়। প্রায় সবগুলোতেই শিখরা মুজাহিদদের হাতে পরাজিত হয়। সাইয়েদ সাহেবের এক পত্র থেকে জানা যায় যে, শেষ পর্যায়ে মোজাহিদদের সংখ্যা ৩ লক্ষে গিয়ে উপনীত হয়েছিল। সাইয়েদ সাহেব ও তাঁর বাহিনী, রণজিৎ সিংহের সুশিক্ষিত খালসা বাহিনীকে পরাজিত করে পেশোয়ার অধিকার করে নেন (১৮৩০ খৃঃ)।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

অতঃপর তিনি কাশ্মীরে প্রধান ঘাটি স্থাপন করতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু আম্বের পায়েন্দা খাঁ বাধা দিতে চেষ্টা করলে মোজাহিদ বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ শাহ্ ইসামাইল আম্ব অধিকার করেন এবং সেখানে প্রধান ঘাটি স্থাপন করেন। আম্ব থেকে মর্দান পর্যন্ত বিশাল এলাকায় তাঁর অধিকার স্বীকৃত হলো। সাইয়েদ আহমদ সেখানে ইসলামী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করলেন। তিনি অধিকৃত এলাকায় মওলানা সাইয়েদ

মযহার আলীকে কাজী (বিচারক) নিযুক্ত করলেন এবং প্রশাসনিক দায়িত্বভার অর্পণ করলেন কাবুলের আমীর দোস্ত মুহাম্মদের ভ্রাতা সুলতান মুহাম্মদের উপর।

ইংরেজ ও বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রঃ শাহাদাতে বালাকোট

নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে সাইয়েদ আহ্মদ পরবর্তী পর্যায়ে ইংরেজ কবলিত সাবেক 'দারুল ইসলাম ভারত' পুনরুদ্ধারের জন্যে আরও অধিক শক্তি সঞ্চয় করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন, কিন্তু অপর দিকেও যুদ্ধে পরাজিত রণজিৎ সিংহ প্রতিশোধ গ্রহণে তৈরী হচ্ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে রনজিৎ শঠতার আশ্রয় নিলেন। অর্থের লোভ দেখিয়ে সীমান্তের পাঠান ও উপজাতীয়দেরকে সাইয়েদ আহ্মদের দলছাড়া করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। সাইয়েদ আহ্মদ ছিলেন কুসংস্কার-বিরোধী। ফলে এ সব পাঠান ও উপজাতীয় লোকদের কেউ কেউ অর্থ লোভে বা কুসংস্কার বশতঃ অকপটে এ আন্দোলনকে গ্রহণ করতে পারেনি। অপর দিকে ইংরেজরাও এই উদীয়মান শক্তি সম্পর্কে ছিলো শঙ্কিত। তারা ঐ সময় ভারতের ঐ অঞ্চল নিয়ে তত মাথা না ঘামালেও শিখদের দ্বারা মুজাহিদদের নিশ্চিহ্ন করতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। মোজাহিদ বাহিনী এবার দ্বিমুখী ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হয়ে পড়লো। উপজাতীয় অনেক পাঠান সরদার শিখদের অর্থলোভ সম্বরণ করতে না পেরে সাইয়েদ আহমদের দল ত্যাগ করলো। অপরদিকে উপজাতীয়দের অনেকে সাইয়েদ আহমদের কুসংস্কার বিরোধী কাজে তাঁর প্রতি অহেতুক অশান্ত হয়ে পড়ে। তারা যেসব বেদআত কাজে লিপ্ত ছিল, মোজাহিদ নেতা সে সবের বিরুদ্ধাচরণ করতেন। কিন্তু তাতেও সংগ্রামী সাইয়েদ আহমদ হতোদ্যম না হয়ে ন্যায় ও সত্যের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রাখতে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করতে থাকলেন। মুশরিকদের বেদআত শির্কের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে যেতে লাগলেন। অনেকের মতে কৌশল গত কারণেই সাইয়েদ সাহেবের ঐ সময় এ থেকে বিরত থাকা সঙ্গত ছিল। কিন্তু তিনি অন্যায়ের সাথে আপোষ নাকরে নিজের কাজ করেই যান। অতঃপর বিশ্বাস ঘাতকরাসহ প্রতিপক্ষ বাহিনী শক্তিশালী হয়ে উঠে। তাতেও তিনি ভীত না হয়ে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বালাকোট নামক স্থানে শিখদের সংগে তাঁর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে খুবি খাঁ নামক এক পাঠানের বিশ্বাসঘাতকতায় সাইয়েদ আহমদ বেরলভী ও মওলানা শাহ্ ইসমাইল দেহলভী শাহাদাত বরণ করেন। -(১৮৩১ খৃঃ)

বালাকোটের মুক্তিযোদ্ধারা দমে যাননি

মওলানা বেলায়েত আলী ও মওলানা এনায়েত আলীর আন্দোলন

বালাকোটে মুক্ত মোজাহিদ বাহিনীর নেতৃবৃন্দের শাহাদাত বরণের পর তাঁদের অনেকেই সীমান্তের ইয়াগিস্তানের সিত্তানায় (আস্তানা-শিবির) সাইয়েদ সাহেবের বিশ্বস্ত খলীফাদের নেতৃত্বে সমবেত হন। উল্লেখ্য যে, সাইয়েদ সাহেব তাঁর শাহাদাতের পূর্বে নিজেই বালাকোটের রণাঙ্গণ থেকে তাঁর বিশিষ্ট খলীফা মওলানা বেলায়েত আলী আজীমাবাদীকে ভারতের অভ্যন্তরে আন্দোলনের উপকরণ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত থাকতে পাঠিয়েছিলেন। বালাকোটের মর্মান্তিক খবর প্রাপ্তির সময় মওলানা বেলায়েত আলী ছিলেন হায়দ্রাবাদে। এ ছাড়া ঐ সময় সাইয়েদ সাহেবের অপর যে একজন বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন, তিনি হলেন মওলানা মুহাম্মদ আলী। তিনি বালাকোট ঘটনার সময় মোজাহেদ রিক্রুটিংয়ের কাজে নিয়োজিত ছিলেন মাদ্রাজে। আজাদী সংগ্রামের মহা নায়কের শাহাদাতের খবরে সাময়িক ভাবে তাঁরা ব্যথায় ভারাক্রান্ত হলেও হতোদ্দম হননি।

এ ঘটনার পর মওলানা বেলায়েত আলী তাবলীগ ও জেহাদের নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। তাঁর ছোট ভাই মওলানা এনায়েত আলীকে বাংলা দেশে পাঠান। মওলানা জয়নুল আবেদীন ও মওলানা মুহাম্মদ আলী হায়দ্রাবাদে কাজ করে যান। এ ভাবে অন্যান্য সহচর ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে তিনি ভারতের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেন। মওলানা বেলায়েত আলী পাটনায় দু'বছর অবস্থানের পর অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকল্পে মক্কা শরীফ গমন করেন। সেখানে হজ্জ সমাধা করে ইয়ামন, নজদ, আসীর, মাসকাত, হাজরামাউত প্রভৃতি রাজ্য সফর করে প্রায় দু'বছর পর কলকাতায় ফিরে আসেন এবং বাংলাদেশ সফর করে ছোট ভাই মওলানা এনায়েত আলীকে সাথে করে পাটনা চলে যান। বিদেশ সফর প্রত্যাগত মওলানা বেলায়েত আলী দ্বিতীয় বার জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি মওলানা এনায়েত আলীকে বাংলার পরিবর্তে ইয়াগিস্তানের সিত্তানায় প্রেরণ করেন। মওলানা এনায়েত শিখ প্রধান গোলাব সিংহের সংঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এ যুদ্ধ তিন বছর কাল স্থায়ী থাকে। এ দিকে মওলানা বেলায়েত আলী তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মওলানা ফরহাত হোসাইনকে পাটনাস্থ কেন্দ্রে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে তিনি মওলানা ফাইয়াজ আলী, মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী, মওলানা আকবর আলী প্রমুখকে নিয়ে বালাকোটে যুদ্ধরত মওলানা এনায়েত আলীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন। মওলানা বেলায়েত আলী সেখানে গিয়ে পৌঁছুলে তাঁকেই আমীর নিযুক্ত করে ইংরেজ দোসরদের বিরুদ্ধে জেহাদ চলতে থাকে। তাঁর নেতৃত্বাধীনও দীর্ঘ দেড় বছর বালাকোট কেন্দ্রিক জেহাদ চলে এবং বহু এলাকা বিজিত হয়।

ইংরেজ সরকারের হস্তক্ষেপ

এ অবস্থা দেখে ইংরেজ সরকার প্রমাদ গুনল যে, শিখদেরকে পরাজিত করেই মোজাহিদগণ তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। তাই শিখদের সাথে পূর্বে সম্পাদিত এক সামরিক চুক্তির ছুতা ধরে ইংরেজরা মওলানা বেলায়েত আলীকে এক নোটিশের মাধ্যমে জানিয়ে দিল যে, শিখ প্রধান গোলাব সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করাকে ইংরেজ সরকার তাদের সঙ্গেই যুদ্ধ বলে বিবেচনা করে। এর কয়েক দিন পরেই ইংরেজ সরকার মোজাহিদদের বিরুদ্ধে সশস্ত্রবাহিনী প্রেরণ করে এবং তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। ইংরেজগণ মোজাহিদ বাহিনীর বড় পৃষ্ঠপোষক সীমান্তের সাইয়েদ জামেন শাহ্ ও অন্যান্য স্থানীয় বিশিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তিকে অর্থলোভ দেখিয়ে ও নানান কৌশলে হাত করে তাদের :ঐক্যে ফাটল ধরায়। এতে নানান চক্রান্তের শিকার হয়ে মুজাহিদরা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আর্থিক উপকরণ সরবরাহ ও জটিল হয়ে দাঁড়ায়। মুজাহিদদের শক্তি ও অনুকূল পরিবেশ নষ্ট হয়। পরিশেষে এক পর্যায়ে মোজাহিদদের গ্রেফতার করা হয় এবং মুজাহিদ নেতা মওলানা বেলায়েত আলীকে পাটনায় এনে দু'বছর বন্দী করে রাখা হয়। মওলানা এনায়েত আলী পুনরায় বাংলাদেশে তাবলীগ ও সাংগঠনিক কাজে চলে আসেন। সামরিকভাবে একশো মুজাহিদ সোয়াতে আত্মগোপন করে থেকে যান।

পুনরায় জেহাদ

দু'বছর পর ছাড়া পেয়ে মওলানা বেলায়েত আলী পুনরায় বহু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে ভ্রাতা মওলানা এনায়েত আলী ও অন্যান্য অনুগামী মোজাহিদদের নিয়ে আবার ইয়াগিস্তানের সিত্তানায় গিয়ে পৌছেন। সাইয়েদ আকবর শাহ্ ও অন্যান্য মোজাহিদ তাদের বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকেও মোজাহিদগণ এখানে আসতে শুরু করেন। মওলানা এনায়েত আলীর সেনাপতিত্বে ইংরেজ তাবেদার আম্বের শাসনকর্তার সঙ্গে পুনঃরায় জিহাদ শুরু হয়। ঐ সময়ই (১২৬৯ হিঃ) মওলানা বেলায়েত আলীর ইন্তেকাল হয় এবং তাঁর স্থানে মওলানা এনায়েত আলী আমীর নিযুক্ত হন। কিন্তু তীব্র প্রতিকূলতা সৃষ্টি হওয়ায় সীমান্ত এলাকায় মুজাহিদদের জেহাদী তৎপরতা শেষের দিকে বন্ধ হয়ে গেলেও মুজাহিদ সংগঠনটি বহাল থেকে যায়।

১৮৫৭ সালের বিপ্লবের সময় বৃটিশ ভারতের বাইরে সীমান্তের ইয়াগিস্তানে মোজাহিদদের নেতৃত্ব ছিল মওলানা এনায়েত আলীর হাতে এবং ভারতের অভ্যন্তরে এ বিপ্লবের মূল নেতৃত্ব দেন ভারতস্থ মোজাহিদ নেতা মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী। মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী ঐ সময় পাটনাস্থ মোজাহেদ কেন্দ্র থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে জেহাদের আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর পরোক্ষ নেতৃত্বেই গোটা ভারতের অভ্যন্তরে মোজাহিদদের আন্দোলনে ৫৭-র বিপ্লব প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে।

১৮৫৮ খৃঃ মওলানা এনায়েত আলীর ইন্তেকালের পর সীমান্তে জেহাদরত মোজাহিদদের নেতৃত্ব দেন যথাক্রমে মওলানা আবদুল্লাহ, মওলানা আবদুল করীম (১৯১৫ খৃঃ ফেব্রুয়ারী) ও মওলানা নেয়ামতুল্লাহ। উল্লেখ্য যে, মওলানা আবদুল করীম পর্যন্তই মওলানা এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলীর প্রত্যক্ষ ট্রেনিং প্রাপ্ত মোজাহিদদের যুগ ছিল। মওলানা নেয়ামতুল্লা ১৯১৫ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে আন্দোলনের আমীর বা নেতা নিযুক্ত হন। অনেকের মতে তিনিই ছিলেন মোজাহিদ আন্দোলনের শেষ আমীর। ভারত বিভাগ পর্যন্ত মোজাহিদদের এ আন্দোলন টিকে ছিল। তবে উপমহাদেশ স্বাধীন হবার পর এ আন্দোলনের একদিকের আবশ্যকতা বাকি না থাকলেও আন্দোলনের মূল লক্ষ্য এদেশে ইসলামী হুকুমাত কায়েমের আবশ্যকতা ফুরায়নি বলে তারা দলের মধ্য হতে পরেও একের পর একজনকে আমীর নিযুক্ত করে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকল্পগত পূর্ব ঐতিহ্য বজায় রাখেন। শোনা যায়, এরপর মওলানা রহমতুল্লাহ্ পর্যায়ক্রমে আমীর নিযুক্ত হন।

বলা বাহুল্য, সীমান্তকে কেন্দ্র করে পরিচালিত আলেমদের এই ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন দমনের জন্য বৃটিশ ভারতের শাসকদেরকে বাজেটের এক বিরাট অংশ ব্যয় করতে হতো। মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীর নেতৃত্বাধীনে ভারতের অভ্যন্তরে আন্দোলনের ব্যাপকতা ও প্রচণ্ডতা কি ছিল, তা বিস্তারিত জানার জন্য এ আন্দোলনের ঘোর বিরোধী স্যার উইলিয়াম হান্টারের "দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান" গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য। মুসলিম বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও হান্টার সাহেবের পক্ষে এসব বাস্তব ঘটনাকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পটভূমি

বালাকোটের সাময়িক ব্যর্থতা নেতৃবৃন্দের শাহাদাত ও পরবর্তী পর্যায়ে মোজাহিদ বাহিনীর উপর ইংরেজদের অকথ্য নির্যাতন সত্ত্বেও এই সংগ্রামী বাহিনীর কর্মীরা নিশ্চুপ বসে থাকেননি। তাঁরা বিভিন্নভাবে উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা-আদর্শ প্রচার ও ইংরেজ বিরোধী ত্রাস সৃষ্টি করে গেছেন। শাহ্ আবদুল আজীজ কর্তৃক প্রচারিত সেই "দারুল হরবের ফতওয়া" এবং পরবর্তী পর্যায়ে তারই ফলশ্রুতি হিসাবে তাঁর অনুসারীগণ কর্তৃক স্বল্পকালস্থায়ী 'ইসলামী রাষ্ট্র গঠন' ও 'বালাকোটের লড়াই' এবং উক্ত লাড়াইয়ের পর কর্মীদের বিভিন্ন তৎপরতার মাধ্যমে ইংরেজ-বিরোধী ভাব জাগ্রত করা– এই সব কিছুই ঐতিহাসিক ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পটভূমি রচনা করেছে– যার সূচনা করেছিলেন শূকরের চর্বিমিশ্রিত বন্দুকের টোটা ব্যবহার ইত্যাদিকে উপলক্ষ্য করে বেরাকপুরের মুসলিম সৈনিকগণ। এ বিপ্লবকে ইংরেজরা সিপাহী বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করলেও মূলতঃ সেটাই ছিলো হিমালয়ান উপমহাদেশে প্রথম বলিষ্ঠ আজাদী আন্দোলন এবং অবিভক্ত ভারত থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করার লক্ষ্যে তাদের প্রতি এক প্রচন্ড আঘাত।

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, এক শ্রেনীর লোকের বিশ্বাস ঘাতকতা, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের অভাব, অনৈক্য ইত্যাদি কারণে মুসলমানদের এ বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ বিপ্লবের নায়ক ছিলেন একমাত্র মুসলিম আলেম সমাজই, যা কোনো কোনো হিন্দু নেতা ও ইংরেজ লেখক হান্টারও তথ্যাবলী সহকারে লিখে গেছেন।

বিপ্লবে জড়িত শত শত আলেমের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন নেতা

মওলানা এনায়েত আলী, মওলানা আহমুদুল্লাহ, মওলানা ইয়াহইয়া আলী, মওলানা জাফর থানেশ্বরী, মওলানা সাখাওয়াত আলী, সাইয়েদ আহমদ তাহের, মওলানা ইমামুদ্দীন, হাকীম মুনয়েম খান দেহলভী, শাহ মুহম্মদ হোসাইন আজীমাবাদী, শাহ মাযহার আলী, চট্টগ্রামের সুফী নূর মুহাম্মদ, মোমেনশাহীর শেখ হাসান আলী, মওলানা ফরহাত হোসাইন, মওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী, শেখ গোলাম আলী, কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ, সাইয়েদ মুহাম্মদ ইয়াকুব, শেখ হামদানী, মওলভী ওয়াজুদ্দীন, মওলান নেজামুদ্দীন দেহলভী, সাইয়েদ নাসের আলী, মিয়া ইহসান উল্লাহ, শেখ মুয়াজ্জেম, হাকীম মুগীসুদ্দীন, মুনাওয়ার খান, সাইয়েদ মুরতজা হোসাইন, মওলানা মুহাম্মদ আলী রামপুরী, মুহাম্মদ আলী মালিহাবাদী, শেখ মুহাম্মদ আলী, সাইয়েদ মূসা, সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী দেহলভী, মওলানা ফসীহ গাজীপুরী, সাইয়েদ আবদুল বাকী, মওলানা আবদুল হাই, মওলানা মুফতি এনায়েত আহমদ, শাহ আহমদ সাঈদ, ঢাকার মওঃ আজীমুদ্দীন, কুমিল্লার মওলানা আশেকুল্লাহ ও বরিশালের মওঃ আমীনুদ্দীন।

মওলানা ইয়াহইয়া আলী, মওলানা জাফর থানেশ্বরী, ও মওলানা খায়রাবাদী বিপ্লবের ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় ফাঁসির দণ্ড প্রাপ্ত হন। এ দণ্ডাদেশ শুনে তাঁরা 'সাক্ষাত জান্নাতে পৌঁছার সুযোগ লাভে' আনন্দ প্রকাশ করায় ইংরেজ সরকার তাদেরকে এ সুযোগ থেকে 'বঞ্চিত' করার উদ্দেশ্যে আন্দামানে নির্বাসিত করেন।

আলেমদের বিপ্লব উত্তর ভূমিকা

১৮৫৭ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর গোটা উপমহাদেশের মুসলিম জীবনে সবচাইতে ঘোর দুর্দিন নেমে আসে। হিন্দুরা ইতিপূর্বেই বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি ও মুসলিম বিদ্বেষ হেতু ইংরেজদের চাটুকারিতায়.লেগে গিয়েছিল। ইংরেজদের আশঙ্কা ছিলো একমাত্র সেই মুসলমানদের পক্ষ থেকেই- যাদের হাত থেকে তারা ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলো। বিশেষ করে ১৮৫৭ সালের বিপ্লব তাদেরকে মুসলমানদের ব্যাপারে অধিক সতর্ক করে দেয়। তাই মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনের ন্যায় তাদের শিক্ষা,

সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনও সংকীর্ণ ও দুর্বিসহ হয়ে ওঠে– যাবতীয় অধিকার থেকে তাদের করা হয় বঞ্চিত। ইংরেজগণ বিপ্লবের জন্যে একমাত্র মুসলমানদেরকেই দায়ী করে তাদেরই ওপর জুলুম-নির্যাতনের স্টীম রোলার চালাতে থাকে। বিপ্লবের নায়ক আলেমগণ ও সাধারণ মুসলমান এজন্যেই ইংরেজদের রোষাণলে পড়ে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলেন, কেউ মাল্টা বা আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত হন, কেউ দীর্ঘকাল যাবত কারা-অন্তরালের আঁধার কক্ষে তিলে তিলে ক্ষয় হন। (১৮৬৩–৬৭ খৃঃ)। বস্তুত এ রোষানল প্রশমিত করার জন্যেই স্যার সাইয়েদ বিদ্রোহের অন্য রকম ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করেন।

এবার আন্দোলন দু'ধারায় চলতে থাকে ঃ স্থানে স্থানে ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র ও গুপ্ত জেহাদী প্রতিষ্ঠান

প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও বালাকোট আন্দোলনে মোজাহিদগণ সংগ্রামের পথ ছেড়ে দেননি। একদিকে তাঁরা সীমান্তে ইয়াগিস্তানে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন, অপর দিকে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র সুযোগ্য বংশধর ও সাইয়েদ সাহেবের মন্ত্রশিষ্য মওলানা শাহ্ ইসহাক সাহেবের নেতৃত্বে পূর্ব থেকে ভারতের অভ্যন্তরে ইংরেজদের চক্ষু এড়িয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চা ও জেহাদের অনুকূলে কাজ চলতে থাকে। তাঁরা সতর্কতার সহিত সে কাজ চালিয়ে যেতেন। মুক্তিযোদ্ধারা স্থানে স্থানে মাদ্রাসা কায়েম ও ধর্মীয় সভাসমিতির মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ টিকিয়ে রাখার কাজ করতেন। এ সঙ্গে খুব সন্তর্পণে জিহাদী প্রচারণা ও ইসলামী জাগরণকে উপমহাদেশে টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা চালান।

দারুল উলুম দেওবন্দ সহ অগণিত প্রতিষ্ঠান কায়েম হলো

বস্তুত ঃ সে প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার অংশ হিসাবেই আমরা বিশ্ব বিখ্যাত উচ্চ দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখতে পাই। এগুলোকে কেন্দ্র করে পরবর্তী পর্যায়ে আরও অসংখ্য শিক্ষা ও গুপ্ত জেহাদী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং উপমহাদেশে ভবিষ্যতের জন্যে ইসলামী পুনর্জাগরণের পথ উন্মুক্ত হয়। উত্তরকালে 'অসহযোগ আন্দোলন' ও 'খেলাফত আন্দোলন'কে উপলক্ষ্য করে মুসলমানদের মধ্যে আযাদী আন্দোলনের যে সাড়া জাগে এবং ১৯৪৭ সালে ইসলামের নামে পাকিস্তান নামক যে রাষ্ট্রটি অর্জিত হয়, এই প্রত্যেকটি কাজেই ঐ সব প্রতিষ্ঠানের অপরিসীম অবদান রয়েছে।

বালাকোট ও পাকিস্তান আন্দোলন বিচ্ছিন্ন ছিল না

বালাকোট কেন্দ্রিক সংগ্রাম আর ৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বিচ্ছিন্ন কোন আন্দোলন ছিল না। বরং শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর প্রেরণায় তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলভী, সাইয়েদ আহমদ শহীদ, মওলানা ইসমাইল শহীদ দেহলভী ও মওলানা আবদুল হাই প্রমুখ ইসলামী আন্দোলনের বীর সিপাহীগণ যেই আপোষহীন সংগ্রাম করেছিলেন, এটা ছিলো সে আন্দোলনেরই পরিশিষ্ট। এ সব নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্বকে যে সুমহান লক্ষ্য আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য অমূল্য জীবন আহুতি দিতে হয়েছিল, উপমহাদেশের মুসলমানগণ কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ও মওলানা শাব্বির আহমদ উসমানীর পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবানের মধ্যে তারই প্রতিধ্বনী শুনতে পেয়েছিল। কায়েদে আজম দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে একাধিকবার ঘোষণা করেছেন যে, "পাকিস্তানের আদর্শ হবে একমাত্র ইসলাম। চৌদ্দশো বছর পূর্বেই আল কুরআন আমাদের শাসনতন্ত্র তৈরী হয়ে আছে।"

দারুল উলুম দেওবন্দ ও আজাদী আন্দোলন

পূর্বেকার আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকল্পে শিখ ও ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত শহীদানে বালাকোটের আন্দোলনেরই একটি অংশ হিসাবে পাকিস্তান আন্দোলন পরিচালিত হয়। সাথে সাথে একথাও স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মাঝখানে এ আন্দোলন দু'টি স্থানকে কেন্দ্র করে তার লক্ষ্যে এগিয়ে যায়। একটি ইয়াগিস্তান অপরটি দারুল উলুম দেওবন্দ। অবশ্য দারুল উলুম দেওবন্দের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও এর অনুসারী পাক-ভারতে কাওমী মাদ্রাসা নামে যে সব অসংখ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে বিশেষ করে বাংলাদেশের দ্বীনি প্রতিষ্ঠান-সমূহের শিক্ষা-নীতিতে বালাকোটের সেই আদর্শিক চেতনা ও সে অনুযায়ী সমাজে নেতৃত্ব গড়ে তোলার উপযোগী শিক্ষা কার্যক্রম কি পরিমাণ উপযোগী তা পর্যালোচনার বিষয়। তবে ৪৭-এর আজাদী হাসিলের পর বিগত দিনগুলোতে এই প্রেরণা যে রকম থাকার দরকার ছিল, সে রকম না থাকলেও একথা নিশ্চিতরূপে বলা চলে যে, এখন আবার সেই সংগ্রামী ভাবধারা ঘুমন্ত দ্বীনি মাদ্রাসাগুলোতে জাগ্রত হয়ে উঠেছে। মাঝখানে তা কিছুকাল স্তিমিত থাকায় বাতিল শক্তিসমূহ সে সুযোগে আমাদের সমাজ জীবনের সর্বস্তরে যথেষ্ট শিকড় বিস্তার করে ফেলেছে– সেটা দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। কিছুটা

অপ্রিয় হলেও প্রসঙ্গটি এ জন্যে টানা হলো যে, বালাকোটের সেই প্রেরণাই যদি সামগ্রিকভাবে এদেশের দ্বীনি প্রতিষ্ঠানসমূহে এতদিন কার্যকর থাকতো আর এ সবের শিক্ষানীতি বাতিলের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবেলায় যোগ্য আলেম নেতৃত্ব তৈরীতে সহায়ক হত, তাহলে আজ সমাজচিত্র ভিন্নতর হতো। বরং সব শিক্ষাকেন্দ্র থেকে যে অসংখ্য ওলামা প্রতি বছর বের হয়ে আসেন, তারা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উপরকরণ থেকে বঞ্চিত। তাদের অনুপস্থিতেই ভোগবাদী ইংরেজ জীবনধারার অনুসারীদের নেতৃত্বের পরিণতি হিসাবে আমাদের সমাজ আজ উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে।

যা হোক, দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার মূল প্রেরণা ও একে কেন্দ্র করে কিভাবে আন্দোলন ধাপে ধাপে অগ্রসর হলো এবং এর সঙ্গে পরে অন্যান্য শক্তি যোগ করে কিভাবে আজাদী সংগ্রামকে শেষ মঞ্জিল পর্যন্ত নিয়ে পৌছালো -এ পর্যায়ে আমরা সে সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

আন্দোলনের কয়েকটি পর্যায়

ইসলামী রেনেসাঁর মূল উদগাতা মহামনীষী ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী শোষণ-হীন খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে ইসলামী আন্দোলনের চিন্তা করেছিলেন, সে আন্দোলনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথম পর্যায় ঃ শাহ ওয়ালিউল্লাহর তিরোধানের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী থেকে নিয়ে বালাকোট প্রান্তরে সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও মওলানা ইসমাইল শহীদের শাহাদাৎ পর্যন্ত (সন ১৮৩১ খৃঃ)। দ্বিতীয় পর্যায়ঃ বালাকোট থেকে নিয়ে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত। তৃতীয় পর্যায় ঃ ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৬৬/৬৭-তে প্রতিষ্ঠিত দারুল উলূম দেওবন্দ কেন্দ্রীক আন্দোলন পর্যন্ত। চতুর্থ পর্যায় ঃ দেওবন্দ থেকে নিয়ে ইংরেজ বিতাড়নের মধ্য দিয়ে আজাদী হাসিল পর্যন্ত। পঞ্চম পর্যায়ঃ হচ্ছে আজাদী হাসিল থেকে বর্তমানের বাংলা-পাক-ভারতে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন। বস্তুত ঃ এদেশকে একটি শোষণমুক্ত ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার আন্দোলন শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভীর ইসলামী আন্দোলনেরই লক্ষ্যাভিসারী এক দুর্বিনিত আন্দোলন যা সর্বপ্রথম বালাকোটকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, বালাকোটে ইসলামী আন্দোলনের সংগ্রামী নেতাদের শাহাদাতের পর শাহ ওয়ালীউল্লাহর সুযোগ্য বংশধর মওলানা শাহ ইসহাক সাহেবের নেতৃত্বে উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলন পরিচালিত হয়। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পূর্বেই

মওলানা শাহ্ ইসহাক আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে তাঁর ভ্রাতা মওলানা এয়াকুবকে নিয়ে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র সফর করেন। বিশেষ করে তিনি তুরস্কের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় চলে যান। আর এমনিভাবে আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল এবার মক্কায় স্থানান্তরিত হয়। -(শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ কী সিয়াসী যিন্দেগী)।

ঐ সময় মক্কা-মদীনা তুর্কী খেলাফতের অধীন ছিল বলে তিনি ভারতীয় মুসলমানদেরকে ইংরেজ কবল থেকে রক্ষা করার জন্য তুরস্ক পররাষ্ট্র দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এ দিকে দিল্লীতে ইসলামী আন্দোলনের সাক্ষাত নেতৃত্ব দানের উদ্দেশ্যে মওলানা শাহ্ ইসহাক দিল্লী কলেজের প্রধান শিক্ষক মওলানা মামলুকুল আলীর সভাপতিত্বে মওলানা কুতুবুদ্দীন দেহ্লভী, মওলানা মুজাফ্ফর হোসাইন কান্দলভী ও মওলানা আবদুল গণী মোজাদ্দেদীর সমন্বয়ে একটি কর্মপরিষদ গঠন করে যান। এই কমিটি মক্কায় অবস্থানরত মওলানা ইসহাকের ইঙ্গিত ও নির্দেশনায় ইসলামী আন্দোলনের কাজ পরিচালনা করতে থাকে। ওয়ালীউল্লাহ আন্দোলনের এই কর্মপরিষদ শাহ্ ওয়ালীউল্লাহর চিন্তাধারা ও বালাকোটের প্রেরণা নিয়ে দুর্বার গতিতে কাজ করে যায়। বস্তুতঃ শাহ্ ইসহাক দেহ্লভীর চিন্তা এবং এই পরিষদের নেতৃবৃন্দের পরিকল্পনা মাফিকই পরবর্তী পর্যায়ে ওয়ালীউল্লাহ্ চিন্তাধারা প্রচারের বাস্তব কর্মক্ষেত্র হিসাবে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মওলানা ইসহাক দেহলভীর নির্দেশেই পরবর্তী পর্যায়ে মওলানা মামলুকুল আলীর পরিবর্তে হাজী এমদাদুল্লাহ্ মোহাজেরে মক্কী (রহঃ) উক্ত কর্মপরিষদের প্রধান নেতা নিয়োজিত হন। এ পরিষদের কাজ ছিল শিক্ষামূলক ও মুসলমানদের মাঝে জেহাদী চেতনা সৃষ্টি। হাজী এমদাদুল্লাহর নেতৃত্বে এই পরিষদ ১৮৫৭ সালের বিপ্লব পর্যন্ত কাজ করে যায়। তবে হাজী ইমদাদুল্লাহ্ সাহেব প্রধান নেতা হলেও বিশিষ্ট বুযর্গ মওলানা আবদুল গণী মুজাদ্দেদী এ পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকেন।

রণাঙ্গনে তিন বুযর্গ

শেষ পর্যন্ত আলেমদের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনই বালাকোট ফেরত অন্যতম মুজাহিদ নেতা মওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীর পরোক্ষ নেতৃত্বে ১৮৫৭ সালে গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। হাজী এমদাদুল্লাহ্ তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে আন্দোলনের কাজ বন্টন করে দেন এবং নিজেও স্বশরীরে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি ১৮৫৭ সালের আজাদী বিপ্লবের সময় থানাভবন ফ্রন্টে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। -(হায়াতে মাদানী)

থানাভবন ফ্রন্টে তাঁর সঙ্গে যেসব মর্দে মুজাহিদ মুসলমান ও সংগ্রামী আলেম জেহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। তন্মধ্যে হাজী এমদাদুল্লাহর সহকর্মী শিষ্য হযরত মওলানা কাসেম নানতুবী, হযরত মওলানা রশীদ আহমদ গংগোহী প্রমুখ আলেমের নাম উল্লেখযোগ্য। হাজার হাজার মুজাহিদ জেহাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রথমে থানাভবনে এসে সমবেত হয়। এখানে তারা জেহাদে একের পর এক স্থান দখল করে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। তাঁরা থানাভবন ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ থেকে ইংরেজ সৈনিকদের বিতাড়িত করে মুক্ত অঞ্চল কায়েম করেন। তারপর জিলা ছাহারান পুরের অভ্যন্তরে ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি অধিকার করতে সমর্থ হন। কিন্তু বালাকোটের ন্যায় এবারও এই ইসলামী আন্দোলন বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়ে তাদের পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে হয়। এখানকার জেহাদে হাজী এমদাদুল্লাহ ছিলেন 'আমীরে মোজাহেদীন' বা মুজাহিদদের প্রধান উপদেষ্টা। হযরত মওলানা কাসেম নানতুবী ছিলেন প্রধান সেনাপতি এবং হযরত মওলানা রশিদ আহমদ গংগোহী প্রধান বিচারক। তাঁরা যে দক্ষতা ও রণ-কৌশলসহকারে এই জেহাদ পরিচালনা করেছিলেন, সেই সংগ্রামী স্মৃতি আমাদের জন্য চিরদিন প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

ফাঁসিকাষ্ঠে ২৮ হাজার মুসলমান ও সাত শত আলেমের শাহাদাত বরণ

জেহাদে মুসলমানরা পরাজিত হলো। উপমহাদেশের মুসলমান পূর্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তভাবে বাঁধা পড়লো ইংরেজদের দাসত্বের জিঞ্জিরে। থানাভবনের এলাকাকে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত করা হলো। বিচারের কোনরূপ অপেক্ষা না করে ভারতের অন্যান্য এলাকার মতো এখানেও প্রকাশ্য রাস্তায় নির্মমভাবে মুসলমানদের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হলো। উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসারদের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, এই সেক্টরে ২৭/২৮ হাজার মুসলমানকে বিনা বিচারে ফাঁসি দেয়া হয়েছে এবং প্রায় সাতশো বিশিষ্ট আলেমকে ফাঁসিকাষ্ঠে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছে। এছাড়া বহু ওলামা ও বুযর্গানে দ্বীন আন্দামান প্রভৃতি দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছেন। তাঁরা দেশবাসী ও আত্মীয় পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিদারুন দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়েছেন। মওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী, মওলানা মুফতী এনায়েত আলী এবং শাহ আহমদ সাঈদ ১৮৫৭ সালের 'বিপ্লব ষড়যন্ত্র মামালায়' দণ্ডিত হন। প্রথম দু'জন মুজাহিদকে উক্ত ষড়যন্ত্র মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তাঁরা জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। -(হায়াতে মাদানী)

বলা বাহুল্য, শুধু থানাভবন এলাকায় যেই বিপুল সংখ্যক মুসলমান ও আলেম শহীদ হয়েছেন, সে হিসাবে গোটা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কি পরিমাণ মুসলমান ও আলেম ওলামাকে শহীদ করা হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। (এক পরিসংখ্যান মোতাবেক আজাদী হাসিল পর্যন্ত ২০ লক্ষ মুসলমান এই মুক্তি সংগ্রামে দুশমনদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন)

এ জেহাদে থানাভবন ফ্রন্টে মওলানা কাসেম নানতুবীর মস্তকে গুলির আঘাত লেগেছিল কিন্তু তা মারাত্মক ছিল না বলে কোনপ্রকারে তিনি রক্ষা পেয়ে যান। মওলানা রশীদ আহমদ গংগোহী এই মুক্তি সংগ্রামের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে ছয় মাস কারাগারে অন্তরীণাবদ্ধ ছিলেন। হযরত মওলানা কাসেম নানতুবী এবং হাজী এমদাদুল্লাহর বিরুদ্ধেও গ্রেফতার পরওয়ানা জারি হয়েছিল। মওলানা নানতুবী বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শে এবং ইসলামী আন্দোলনের স্বার্থে প্রথম তিন দিন আত্মগোপন করে থাকলেও পরে তিনি দিব্বি রাস্তা-ঘাটে ঘোরাফেরা করতে থাকেন। কেউ তাঁকে সতর্ক করতে গেলে তিনি এই উক্তি করতেন যে, প্রিয় নবী 'হিরা' গুহার মধ্যে কাফেরদের নিকট থেকে মাত্র তিনদিন আত্মগোপন করে ছিলেন, কাজেই আমি তার বেশী করতে রাজি নই। তাতে যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হোকনা কেন আমি হাসিমুখে তা বরণ করে নেবো। আল্লাহর মর্জি, তিনদিন পরেই তাঁর উপর থেকে গ্রেফতারী ওয়ারেন্ট তুলে নেয়া হয়।

১৮৫৭ সালের ইংরেজ বিরোধী গনজেহাদের মূলে ছিল ইসলামী চেতনা। আর তার অন্যতম নায়ক ছিলেন উক্ত তিন বুজর্গ। কিন্তু আল্লাহর অসীম মেহেরবানীতে এবং উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শকে উজ্জীবিত রাখার স্বার্থে কিভাবে তাঁরা বেঁচে গেলেন, তা সত্যই এক বিস্ময়কর ঘটনা।

হাজী ইমদাদুল্লাহর মক্কায় হিজরত

হাজী ইমাদুল্লাহর বিরুদ্ধে যখন কঠোরভাবে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হয়, তখন ঐ পরিস্থিতিতে পাল্টা জেহাদের কোনো সুযোগ নেই দেখে তিনি হিজরত করা সমীচীন মনে করেন এবং পবিত্র মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন।

কিন্তু চতুর্দিকে বিনা কারণে ধর-পাকড়, এদিক-সেদিক গ্রেফতারী পরোয়ানা, তাই তিনি সতর্কতার সঙ্গে চলতে লাগলেন। যাত্রা পথে বহুস্থানে তিনি গোয়েন্দা পুলিশের হাতে ধরা পড়েও অলৌকিক ভাবে রক্ষা পেয়ে যান। পাটনা, হায়রাবাদ, সিন্ধু-পাঞ্জাব

প্রভৃতি এলাকা হয়ে তিনি মক্কা শরীফে গিয়ে পৌঁছেন। স্থানাভাবে তাঁর যাতায়াতকালের অলৌকিক ঘটনাসমূহের এখানে বর্ণনা দান সম্ভব হলো না।– (নকশে হায়াত)

দারুল উলূম দেওবন্দ

১৮৫৭ সালের গোলযোগের সময় যখন ইংরেজ সরাসরি দিল্লীকে নিজেদের করায়ত্তে নিয়ে নিলো এবং সম্রাটদের নামে মাত্র আধিপত্যটুকুও খতম করে দিল, তখন ওয়ালিউল্লাহ আন্দোলনের সক্রিয় নেতৃত্ব দানের দায়িত্ব হাজী এমদাদুল্লাহর সহকর্মী শিষ্যদের উপর অর্পিত হলো। তাঁরা মক্কায় অবস্থারত প্রধান পৃষ্ঠপোষক হাজী ইমদাদুল্লাহর নির্দেশে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে এ আন্দোলনের ধারাকে আক্রমণমূলক না করে প্রতিরক্ষামূলক করার দিকে মনযোগী হলেন। এ উদ্দেশ্যে ওয়ালিউল্লাহ আন্দোলনের কর্মপরিষদ দিল্লীস্থ ওয়ালিউল্লাহর রহীমিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নমুনায় একটি ইসলামী শিক্ষা ও প্রচার কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন। এসঙ্গে তাঁরা এও সিদ্ধান্ত নিলেন যে, দিল্লীতে ইংরেজদের নাকের ডগার উপর থেকে এ আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল বাইরে নিয়ে যেতে হবে। মওলানা কাসেম নানতুবী অন্যান্য সহকর্মীদের নিয়ে এ উদ্দেশ্যে স্থান ও প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের ব্যাপারে তাঁরা চিন্তাভাবনা করতে থাকেন।

অবশেষে দিল্লীর পতনের নয় বছর পর ১৮৬৬ খৃঃ (১২৮৩ হিঃ) দেওবন্দ মওলানা কাসেম নানতুবীর প্রচেষ্টায় প্রস্তাবিত ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। দেওবন্দ দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার ছয় মাস পর তাঁরই প্রচেষ্টায় ছাহারানপুরে এর আরেকটি শাখা উদ্বোধন করা হয়। এমনিভাবে অল্পদিনের মধ্যেই আরও প্রায় ৪০টি প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়।

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইসলামী আন্দোলনের এসব বীর মোজাহেদদেরই একজন গিয়ে যখন হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেবকে মক্কায় এই সুসংবাদ প্রদান করলেন যে, হুযুর, আমরা দেওবন্দে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছি– এর জন্যে দোয়া করবেন। এ কথা শুনে হাজী সাহেব স্বানন্দে বলে উঠলেনঃ "সোবহানাল্লাহ! আপনারা মাদ্রাসা কায়েম করেছেন? আপনি কি জানেন গভীর রাত্রে কি পরিমাণ মস্তক এজন্যে সিজদায় পড়ে থাকে? আজ বহুদিন যাবত এ উদ্দেশ্যে আমরা দোয়া করে আসছি যেন আল্লাহ পাক ভারতবর্ষে ইসলাম রক্ষার একটি ব্যবস্থা করেন? এই

মাদ্রাসাটি মূলতঃ সে সব বিনিদ্র রজনীর দোয়ারই ফল বিশেষ। দেওবন্দের মাটির জন্যে এটা কতইনা সৌভাগ্যের বিষয় যে, তার বুকে এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি স্থাপিত হলো।"

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম শিক্ষক ছিলেন মোল্লা মাহ্‌মুদ সাহেব আর প্রথম ছাত্র ছিলেন (হযরত মওলানা) মাহ্‌মুদুল হাসান। আর যেই বুযর্গ সর্বপ্রথম এর প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন, তিনি হলেন হযরত মওলানা ইয়াকুব। তিনি পূর্বে আজমীর বা অন্য কোনো এক স্থানে ইসলামী শিক্ষাদানের কাজে রত ছিলেন। হযরত মওলানা ইয়াকুব ছিলেন মওলানা ইসহাক সাহেব কর্তৃক গঠিত ওয়ালিউল্লাহ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের এককালের সভাপতি মওলানা মামলুকুল আলী সাহেবের পুত্র। মওলানা মামলূকুল আলীর শিক্ষকের (মওলানা রশীদুদ্দীন) শিক্ষক ছিলেন হযরত মওলানা শাহ্ আবদুল আজীজ দেহ্‌লভী।

মওলানা কাসেম নানতুবী ও মওলানা রশীদ আহমদ গংগূহী মওলানা মামলুকুল আলীর নিকট কিতাব অধ্যয়ন করেন এবং শাহ্ আবদুল গনীর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। উল্লেখযোগ্য যে, মওলানা মামলূকুল আলী ছিলেন মওলানা ইয়াকুব সাহেব এবং স্যার সাইয়েদ আহমদের উস্তাদ। কিন্তু একই শিক্ষকের ছাত্র হলেও রাজনীতিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাইয়েদের চিন্তাধারা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। ৫৭-বিপ্লবের পর তিনি ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ বিরোধীতা করতেন না। বরং কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতিতে তিনি ইংরেজী শিক্ষার অনুকূলে মতপোষন করেন। মাওলানা নান্‌তুবীর সঙ্গে তাঁর মতের গড়মিল দেখা দেয়। সেই মতবিরোধই পরে দেওবন্দ-আলীগড় বিরোধিতার রূপ নেয়।

প্রথম অধ্যক্ষ

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন হযরত হাজী সাইয়েদ আবেদ হোসাইন। উল্লেখ্য যে, হযরত মওলানা কাসেম নানতুবী যদিও দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কিন্তু তিনি কোনো দিন এ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেননি। মওলানা সাইয়েদ আবেদ হোসাইনের পরে মওলানা শাহ্ রফীউদ্দিন দারুল উলূমের অধ্যক্ষ ছিলেন।

দারুল উলুমের প্রথম পরিচালনা কমিটি

১। হযরত মওলানা কাসেম নানতুবী

২। হাজী আবেদ হোসাইন

৩। মওলানা মাহ্‌তাব আলী দেওবন্দী

৪। মওলানা জুলফিকার আলী দেওবন্দী (হযরত শায়খুলহিন্দ মওলানা মাহ্‌মুদুল হাসানের পিতা)

৫। মওলানা ফজলুর রহমান দেওবন্দী

৬। শায়েখ নেহাল আহ্‌মদ দেওবন্দী

৭। মুনশী ফযলে হক দেওবন্দী

প্রথম অবসর প্রাপ্ত ছাত্রবৃন্দ

১। শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহ্‌মুদুল হাসান

২। মওলানা আবদুল হক

৩। মওলানা ফখরুল হাসান গংগূহী

৪। মওলানা ফৎহে মুহাম্মদ থানভী

৫। মওলানা আবদুল্লাহ জালালাবাদী

সংগ্রামী নেতা শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম হেডমুদার্রিস ছিলেন হযরত মওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব। অত্রারপর এই পদে দায়িত্ব পালন করে হযরত মওলানা সাইয়েদ আহ্মদ দেহ্লভী। অতঃপর শায়খুল হিন্দ হযরত মওলানা মাহ্মুদুল হাসান দারুল উলূমের হেড মুদার্রিস নিয়োজিত হন। (১২০৮-১২৩৩ হিঃ। শায়খুল হিন্দ সংগ্রামী নেতা মওলানা কাসেম নানতুবী ও রশিদ আহ্মদ গংগূহীর শিষ্য ছিলেন বলে তিনি দেওবন্দ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই তাঁর শিক্ষকতার জীবনেও দেখা গেছে যে, তিনি শুধু প্রতিক্রিয়াযুক্ত, নির্লিপ্ত গতিহীন তাক্ওয়া-পরহেযগারীর উপদেশ, তালিম বা শিক্ষা-প্রশিক্ষণই দিতেন না বরং তাঁর তরবিয়তের ফলে ছাত্রদের মধ্যে রীতিমতো প্রাণাবেগের সৃষ্টি হতো। বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে তারা হয়ে উঠতো উদ্বেলিত। এ কারণেই তাঁর শিষ্যরা ছিলেন উপমহাদেশের রাজনৈতিক গগনের এক একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র।

শায়খুল হিন্দ-এর বিশিষ্ট শিষ্যবৃন্দ

১। আজাদী আন্দোলনের বীর সেনানী মওলানা হোসাইন আহ্মদ মাদানী (মোহাদ্দেস ও হেড মোদার্রিস দারুল উলূম দেওবন্দ, সভাপতি জমইয়তে ওলামায়ে হিন্দ)।

২। মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী

৩। মওলানা সাইয়েদ আনওয়ার শাহ্ কাশমীরী

৪। মওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ (সভাপতি জমইয়তে ওলামায়ে হিন্দ)

৫। মওলানা মুহাম্মদ মিঞা ওরফে (মওলানা মনসুর আনসারী)

৬। মওলানা হাবীবুর রহমান (সাবেক মোহতামিম দারুল উলূম দেওবন্দ)

৭। আল্লামা শাববীর আহ্মদ ওসমানী (শায়খুল আদব ওয়াল ফিক্হ ও হেড মুদার্রিস দারুল উলূম দেওবন্দ, শায়খুল ইসলাম পাকিস্তান ও সভাপতি জমইয়তে ওলামায়ে ইসলাম।)

৮। শায়খুল আদব ওয়াল ফিক্হ, মওলানা মুহাম্মদ ইযায আলী, দারুল উলূম দেওবন্দ।

৯। মওলানা ফখরুদ্দীন আহ্মদ (শায়খুল হাদীস জামেয়ায়ে কাসেমিয়া, মুরাদাবাদ)।

১০। মওলানা ইবরাহীম বিলইয়াবী (অধ্যাপক দারুল উলূম দেওবন্দ)

১১। মওলানা আবদুস সামী (অধ্যাপক দারুল উলূম দেওবন্দ)

১২। মওলানা আহমদ আলী (মুহতামিম আঞ্জুমানে খুদ্দামুদ্দীন শিরীনওয়ালা, লাহোর।

১৩। মওলানা মুহাম্মদ সাদেক করাচী, প্রমুখ।

ইংরেজ সরকার উৎখাতের জন্যে ইরান ও আফগানিস্তানের সাহায্য কামনা

ভারত থেকে ইংরেজ সরকারকে উৎখাত আন্দোলনে মওলানা মাহমুদুল হাসান যে ত্যাগ ও সংগ্রাম করেছেন, তা শুধু উপমহাদেশের আলেম সমাজ বা সাধারণ মুসলমানই নয় বরং বিশ্বের মুক্তিকামী যে কোনো মানুষের জন্যে চিরদিন অনুপ্রেরণা রূপে কাজ করবে। তিনি এ উদ্দেশ্যে ইরান, তুরস্ক ও আফগানিস্তানের শাসকদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। এসব ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ ও উপজাতীয় পাঠানদের মধ্যে তিনি জিহাদী ভাব সৃষ্টি করেন এবং সম্মিলিতভাবে ইংরেজদের উপর আক্রমণ চালিয়ে সাবেক মুসলিম শাসিত ভারতকে তার স্বাধীন 'ইসলামী হিন্দুস্থান' পরিচয়ে ফিরিয়ে নেয়ার আন্দোলন চালান। শায়খুল-হিন্দ এ উদ্দেশ্যে মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীকে প্রেরণ করেছিলেন। উপজাতীয় পাঠানগণ এবং আফগান শাসকের নিকট আর নিজে তুরস্ক সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে হেজাজ গমন করেন। তুর্কী খেলাফতের অধীনে তৎকালীন হেজাজের তুর্কী শাসক গালিব পাশা ও তুরস্কের সেনাবাহিনী প্রধান আনওয়ার পাশার সঙ্গে মওলানা মাহ্মুদুল হাসান সাক্ষাত করেন এবং আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন।

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস তদানীন্তন আরব শাসক শরীফ হোসাইন ইংরেজদের উস্কানীতে তুরস্ক সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসেন। শরীফ হোসাইন ইংরেজদের সঙ্গে যুক্ত হন। ফলে হেজাজেও ইংরেজ শক্তির দৌরাত্ম চলে। এ দিকে বৃটিশ সরকারও শায়খুল হিন্দের ইংরেজ সরকার উচ্ছেদ আন্দোলন সম্পর্কে অবগত হয়। ইংরেজগণ তাদের তাবেদার আরব শাসক শরীফ হোসাইনের দ্বারা শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহ্মুদুল হাসানকে গ্রেফতার করেন (১৯১৬) ইং। ফলে প্রায় ৫ বছর পর্যন্ত মাল্টাদ্বীপে তাঁকে গ্লানিকর নির্বাসন জীবন যাপন করতে হয়। সেই নির্যাতনের ইতিহাস সুদীর্ঘ ও মর্মস্পর্শী। মাল্টাদ্বীপ থেকে তিনি মুক্তি পাওয়ার পর (১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ) ভারতে ফিরে আসেন এবং খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে আবার সংগ্রামে লিপ্ত হন। মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধিকে ইংরেজ সরকার ভারত থেকে বহিষ্কার করেন। শায়খুল-হিন্দের সঙ্গে এ আন্দোলনে আলীগড়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিপ্লবী ব্যক্তিগণও জড়িত ছিলেন। যেমন মওলানা মুহাম্মদ আলী ও ডক্টর মোখতার আহমদ আনসারী প্রমুখ।

শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশ তথা মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করার

জন্যে যে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন, সেই সংস্থাটির নাম ছিল "জমিয়তে আনছারুল্লাহ"। এ সংস্থার বিপ্লবী পরিষদকে 'আজাদ হিন্দ মিশন'ও বলা হতো। এর সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মওলানা হাজী তোরঙ্গজয়ী, মওলানা লুৎফুর রহমান, মওলানা ফযলে রাব্বী, মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী। এ সময় তাঁর অন্যতম ছাত্র ও পরবর্তীকালের শায়খুলহিন্দ মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী পবিত্র মদীন থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। শায়খুলহিন্দের দরবারে থেকে ইলমে হাদীস ও রুহানিয়াত তথা আত্মিক পরিশুদ্ধির অনুশীলনের সাথে সাথে এই বিপ্লবী আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ভাবে সহযোগিতা করে যান। উল্লেখ্য, মওলানা মাদানীও তাঁর শায়েখ ও রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে মক্কায় বন্দী হয়ে মাল্টাদ্বীপে নির্বাসিত জীবন যাপন করেন।

মাল্টা দ্বীপে নির্বাসন ও তার পূর্বে মক্কায় বন্দী হবার বিস্তারিত বিবরণ দান এখানে সম্ভব না হলেও তিনি যে কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এবং তা বাস্তবায়নের কি পন্থা চিন্তা করেছিলেন ও কখন মক্কা গিয়েছিলেন, তা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

শায়খুল হিন্দের ইংরেজখেদা আন্দোলনের পরিকল্পনা

উক্ত পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে ইংরেজ শাসন বলয়ের বাইরে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের 'ইয়াগিস্তান' এলাকায় 'আযাদ হিন্দ মিশনে'র কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ইংরেজ সামাজ্যবাদীদের সঙ্গে জেহাদের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র, অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহ ইত্যাদি সর্বপ্রকার আয়োজন চলতে থাকে।

তখনই ইউরোপের কতিপয় শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তুর্কী খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি এলাকা আক্রমণ করে এবং ইংরেজগণ তুর্কী সরকারের দু'টি যুদ্ধ জাহাজ আটক করে ফেলে। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারত সহ সমগ্র মুসলিম জাহানে নতুন করে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিক্ষোভ বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ে।

এসব অবাঞ্ছিত কারণে তুর্কী সরকারও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ঘোষণা করে। এদিকে বৃটেন, রাশিয়া প্রমুখ শক্তিবর্গ তুর্কী খেলাফতের উপর বিভিন্ন দিক হতে চতুর্মুখী আক্রমণ করে বসে। ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে ভূপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে মুছে ফেলাই ছিল তাদের আসল লক্ষ্য।

দেওবন্দী মোজাহেদগণ ইংরেজদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন

এহেন সংকট কালে হযরত শায়খুল হিন্দ ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এলাকা হতে বিপ্লব অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নেন। তিনি মওলানা হাজী তোরঙ্গযয়ীর নেতৃত্বে ইয়াগিস্তান কেন্দ্র থেকে বৃটিশ সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী মুজাহিদগণ বীরবিক্রমে শত্রু বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে। মুক্তি-যোদ্ধাদের আক্রমণে ইংরেজ শক্তি পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করে। তাতে

বহু ইংরেজ সৈনিক হতাহত হয়। কিন্তু কুচক্রী ইংরেজগোষ্ঠী মুজাহিদের দুর্দমনীয় আক্রমণের ঝক্কি সামলাতে না পেরে একদিকে কতিপয় স্বার্থপর ভাড়াটিয়া শিক্ষিতকে হাত করে নেয়, অপরদিকে সরকারী তল্পীবাহক জনৈক মওলভীর দ্বারা জেহাদের বিরুদ্ধে ফতওয়া প্রচার করতে থাকে। কিন্তু কাবুলের বাদশাহ আমীর হাবীবুল্লাহ খানকে প্রচুর অর্থ ও নানান প্রলোভনে তার দ্বারা ইংরেজরা কাবুল সীমান্তের উক্ত জেহাদী আন্দোলনকে বানচাল করে দিতে প্রয়াস পায়।

এই মহাবিপর্যয় ও সংকট মুহূর্তে বিপ্লবীগণ মুসলিম রাষ্টসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। তাই হিজরী ১৩৩৩ সনে শায়খুল হিন্দ হিজাজ অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু ইংরেজদের কড়া দৃষ্টি এড়িয়ে বাইরে সফর করা তাঁর পক্ষে মুশকিল ছিল। তবুও তিনি আল্লাহর প্রতি ভরসা করে রওয়ানা হন। কিন্তু সে খবরটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় শায়খুল হিন্দের বিদেশ যাওয়ার খবরে ইংরেজ সরকার প্রমাদ গণলো। ভারতের অভ্যন্তরে গ্রেফতার করা হলে বিশৃংখলার সম্ভাবনা রয়েছে ভেবে বোম্বাই ঘাটে স্টীমারে আরোহণকালে গ্রেফতার করার পরিকল্পনা নেয়। ইউ পি সরকার বোম্বাইয়ের গভর্ণরের নিকট এই মর্মে তারবার্তা প্রেরণ করেন। কিন্তু বার্তা পৌঁছার পূর্বেই জাহাজ ছেড়ে দেয়া হয়।

যাহোক, হিজাজের তুর্কী প্রতিনিধি গালিব পাশার মাধ্যমে আরবের উক্ত এলাকার তুর্কী কর্মকর্তা জামাল পাশা ও সেনাবাহিনী প্রধান আনোয়ার পাশার সঙ্গে শায়খুল হিন্দের চুক্তি হয় যে, আনোয়ার পাশা ও জামাল পাশার স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতি অনুরোধপত্র ও নির্দেশাবলী ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে এবং তিনি নিজে যে-কোনো প্রকারে হোক সংগ্রামের ঘাটি ইয়াগিস্তানে চলে যাবেন। সেখান থেকে ভারতে ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে পূর্ণোদ্যমে সক্রিয়ভাবে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন চালানো হবে। তুর্কী কর্মকর্তাদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তিটির নাম ছিলো "গালিব নামা।" রাওলেট এ্যাক্ট কমিটির রিপোর্টে সেই চুক্তির সংগ্রামী ভূমিকার বিশেষ অংশ হলো ঃ

"হে ভারতবাসী ! এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মুসলমানগণ সর্ব প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আল্লাহর অনুগ্রহে তুর্কী সেনাবাহিনী এবং মুজাহিদগণ সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন। সুতরাং হে মুসলমান, তোমরা যে ইংরেজ শক্তির লৌহ[illegible]ে আবদ্ধ রয়েছো, সংঘবদ্ধভাবে তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার চেষ্টা ও সামর্থ্য নিয়ে পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে আসো। দেওবন্দ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মওলানা মাহ্মুদুল হাসানের সঙ্গে একমত হয়ে তাকে আমরা ঐ বিষয়ে পরামর্শ দান করেছি; ধন, জন, ও সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সমর উপকরণ দ্বারা তাঁর সহযোগিতা করো। এতে কিছুমাত্র ইতস্তঃত করো না।"

কিন্তু এ পরিকল্পনা নিয়ে মওলানা মাহ্‌মুদুল হাসান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করবেন ঠিক এমন সময় (১৯১৬ খৃঃ) ইংরেজরা ষড়যন্ত্র করে মক্কার ইংরেজ-তাবেদার শাসক শরীফ হোসাইনের দ্বারা তাঁকে গ্রেফতার করে। শরীফ হোসাইনের সমর্থনসূচক বক্তব্য এবং "আরবদেশ শাসনকারী তুর্কী খলীফা ও তুর্কীগণ কাফের ও খেলাফতের অযোগ্য" এই মর্মে লিখিত একটি ফতওয়ায় দস্তখত করতে তাঁকে চাপ দেওয়া হয়। তিনি ঘৃনা ভরে তাতে অস্বীকৃতি জানান। অতঃপর তাঁর শিষ্য মওলানা মাদানীসহ কতিপয় বিপ্লবী আলেমকে গ্রেফতার করে মাল্টা দ্বীপে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, তখন মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল তুরস্কের স্তাম্বুলে। মক্কা-মদীনা ছিল তুরস্ক খেলাফতের অধীন আরব প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। শরীফ হোসাইন বিচিচ্ছন্নতাবাদী আন্দোলনের নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলেন।

রাওলেট অ্যাক্ট কমিটি

অবিভক্ত ভারত থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করে ভারত স্বাধীন করা এবং এখানে পুনরায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্‌র চিন্তাধারার ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালিত হয়। শাহ্ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী থেকে শুরু করে শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহ্‌মুদুল হাসান পর্যন্ত কয়েকটি বিপ্লব ঘটে যায়। বাংলা-পাক-ভারতের আলেম সমাজই ছিলেন এসব বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোধা। ১৮৩১ খৃঃ বালাকোট জেহাদ ও ১৮৫৭ সালের রক্তাক্ত সংগ্রামের পর বিপ্লবী আলেমগণ পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে একান্ত গোপনীয় ভাবে এ আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চালিয়ে যান। শত্রুপক্ষ প্রথম প্রথম এর কিছুই টের পায়নি। ফলে ইংরেজ সরকারকে বহু ক্ষেত্রে মুক্তি-যোদ্ধা মুজাহেদ বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হতে হয়। এখাতে ইংরেজ সরকারের বহু কোটি টাকা ব্যয় হয় এবং ক্ষয় হয় অসংখ্য সৈন্য। ইংরেজগণ নির্বিঘ্নে টিকে থাকতে পারে এমন উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না। অবশেষে তারা বিভ্রান্ত ও হতবুদ্ধি হয়ে এসব বিপ্লবের মূল তথ্য উদ্‌ঘাটন ও এর মূলোচ্ছেদের লক্ষ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। এটাই হচ্ছে রাওলেট অ্যাক্ট কমিটি।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করতে সক্ষম হয়। কমিটি মওলানা শায়খুলহিন্দের "আনছারুল্লাহ" সংস্থার বিপ্লবী শাখা "আজাদ হিন্দ মিশন" আন্দোলনের অনেক ঘটনারই তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি। যে কয়টি বিষয়ের আবিষ্কার করেছে তাও অসম্পূর্ণ। তাতে আলেমগণ ও তাদের বিপ্লবী সহকর্মীদের কর্মতৎপরতা এবং রাজনীতি ও যুদ্ধনীতির ক্ষেত্রে যে অদম্য সাহস ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, সেটা আধুনিক শিক্ষিত যুবকদের কাছে অবাকই মনে হবে। মনে করার কারণও রয়েছে, কেননা ঐ সকল সংগ্রামী আলেমের শিষ্য-শাগরিদদের অনুসৃত

নীতিতে সেই সংগ্রামী ভাবধারার যথাযথ প্রতিফলন তারা মাঝ-খানে দীর্ঘ দিন দেখতে পায়নি। যাহোক, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ও পরিবেশে লালিত শিক্ষিত কতিপয় যুবক তাতে হতবাক হলেও একথা সত্য যে, বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি উন্নত রাষ্ট্রসমূহের কর্মকর্তা এবং ঐ সকল দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিক ও কুটনীতিকরা বিদেশ সম্পর্কে সচেতন বলে উপমহাদেশের আলেমগণের দুঃসাহসিকতা পূর্ণ আন্দোলন, তাদের রাজনীতি, সমরনীতি, রাজ্য পরিচালনায় অগাধ জ্ঞান ও দক্ষতার বিষয়ে সচেতন ছিলেন। বিশেষ করে শায়খুলহিন্দ মওলানা মাহ্মূদুল হাসানের "আজাদ হিন্দ মিশনের" দুর্দমনীয় সতর্কতাপূর্ণ আন্দোলনের নামে বৃটিশ সরকার যে আতঙ্কিত থাকতো, তাদের লেখকদের লেখাই তার বড় প্রমাণ।

অবিভক্ত ভারতের আলেম সমাজ ইংরেজদের বিরুদ্ধে কিরূপ বীরত্বপূর্ণ আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন, প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক ইউলিয়াম হান্টার লিখিত 'আওয়ার ইণ্ডিয়ান মুসলমান' গ্রন্থে তাঁর আক্ষেপ থেকেও সেটা আঁচ করা যেতে পারে। তা হচ্ছে এই–

"এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভারত গভর্ণমেন্ট যদি পূর্ব থেকেই ষড়যন্ত্র আইনের ৩নং ধারা অনুযায়ী ভারতে আলেমদের কঠোর হস্তে দমন করতো, তা হলে ভারত গভর্ণমেন্টকে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মোজাহিদ আলেমদের আক্রমণের ফলে এত দুঃখ ভোগ করতে হতোনা। কতিপয় প্রসিদ্ধ আলেমকে গ্রেফতার করা হলে আম্বালা ঘাটিতে আমাদের এক সহস্র সৈন্য হতাহত হতো না এবং লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড অর্থও বেঁচে যেতো। এমন কি উক্ত লড়াইর পরও যদি কঠোর হস্তে আলেমদেরকে দমন করা হতো, তবে অন্ততঃ পক্ষে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড় অভিযান হতে রক্ষা পাওয়ার আশা ছিল।"

এমনিভাবে শায়খুলহিন্দ মওলানা মাহ্মুদুল হাসান প্রমুখ বিপ্লবী আলেমের ইংরেজ-খেদা আন্দোলন ও ষড়যন্ত্রের বিবরণ তাদের লেখায় প্রকাশ পায়। ঐ সকল বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ভারতীয় মুক্তি যোদ্ধাদের ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। ইংরেজ সরকারের ফাইলে তাকে 'রেশমী রুমালের চিঠি' নামে অভিহিত করা হয়। কারণ, ইংরেজ বিরোধী পরিকল্পনা সম্বলিত লেখা চিঠিটি রেশমী কাপড়ে লেখা ছিল। তাতে–

"ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত থেকে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ আছে এবং ভারতের মুসলমানদের পূর্ণোদ্যমে অগ্রসর হয়ে বৃটিশ হুকুমতকে উচ্ছেদ করার কথাও ছিল। "উক্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে মওলভী ওবায়দুল্লাহ নামক এক ব্যক্তি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তার সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে। মওলভী ওবায়দুল্লাহ পূর্বে শিখ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে প্রথমতঃ ছাহারানপুর জিলার

অন্তর্গত দেওবন্দে মুসলমানদের ধর্মীয় মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করে ফাজেল ডিগ্রী লাভ করেন এবং কতিপয় মওলভীকে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও আক্রমণ পরিচালনার পক্ষে তাঁর মতাবলম্বী করে তোলেন। তন্মধ্যে মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মওলানা মাহমুদুল হাসান ছিলেন প্রধান নায়ক। মওলভী ওবায়দুল্লাহর একান্ত ইচ্ছা ছিল, দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেমদের সহযোগিতায় সারা ভারতে ইসলামী হুকুমাতের প্রেরণা জাগ্রত করে মুসলমানদেরকে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করা।"

বস্তুতঃ এসব কারণেই বৃটিশ ভারতের মুসলমান তাদের প্রিয় সংগ্রামী নেতা শায়খুলহিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসানকে কেন্দ্র করে রণোন্মাদনা-মূলক গান গেয়ে গেয়ে কুখ্যাত ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলিম যুবসমাজের উষ্ণ রক্তে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করতো। সেদিন কেবল সিন্ধু, মাদ্রাজ, ইউ পিতেই নয় বাংলার পথে-ঘাটে, গঞ্জে-বাজারে, বন্দরেও এই ধ্বনি উচ্চারিত হতে শোনা যেতো যে,-

"মুসলমানের শেখুল হিন্দ বন্দী আছে মাল্টাতে,
চল খেলাফত উদ্ধারে মুসলমানী যেতে বসেছে।"

যাহোক, এই সিংহদিল মহান সংগ্রামী নেতা মাল্টার কারাজীবন শেষে ভারতে এসে যখন খেলাফত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তখন তাঁর কারাক্লান্ত দেহ অধিক পরিশ্রম হেতু আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশ্য এই দুর্বলতা নিয়েও তিনি আন্দোলন করে যান। এমনকি তাঁর জীবদ্দশাতেই যখন অসহযোগ আন্দোলন দেখা দেয়, তখনও তাঁকে মওলানা আবুল কালাম আজাদের অনুরোধে দুর্বল শরীর নিয়ে সরকার নিয়ন্ত্রণমুক্ত জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিল্লীর বিখ্যাত "জামায়ায়ে মিল্লিয়া'র দ্বারোদঘাটন করতে দেখা যায়। কিন্তু বার্ধক্যপীড়ার মধ্যে অস্বাভাবিক পরিশ্রমের দরুণ শেষ পর্যন্ত তাঁর শরীর বেশীদিন টিকেনি। ১৯২০ সালে মওলানা মাহমুদুল হাসান সংগ্রামরত ভারতীয় মুসলমানদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণ করলেন।

সংগ্রামী নেতা মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী

শায়খুলহিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসানের ইন্তেকালের পর ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে দেওবন্দ বাহিনীর পক্ষ থেকে ভারতে মুসলমানদের নেতৃত্ব দানে যাঁরা এগিয়ে আসেন, তাঁদের মধ্যে মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) ও মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানীর ত্যাগ ও সংগ্রাম অপরিসীম। উভয়ই ছিলেন মওলানা মাহমুদুল হাসানের যোগ্য সহকর্মী শিষ্য। মওলানা মাদানী মহান সংগ্রামী উস্তাদের আদর্শ এবং দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাঁর গোটা

জীবনকে দ্বীন ও মিল্লাতের স্বার্থে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরীর (রহঃ) পর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান অধ্যাপক নিয়োজিত হন। এক কালের অবিভক্ত ভারতের আলেমদের সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের'ও তিনি সভাপতি ছিলেন (১৯২৩ খৃঃ)। মওলানা মাদানী অসহযোগ আন্দোলন সহ অখণ্ড ভারতের পূর্ণ আজাদী পর্যন্ত হিমালয়ের মতো অটলভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যান। এ উদ্দেশ্যে তিনি সারা ভারতের আনাচে কানাচে বহুবার সফর করেন। মওলানা মাদানীকে কয়েকবার ইংরেজ সরকার জেলে আবদ্ধ রেখে তাঁর প্রতি অকথ্য জুলুম নির্যাতন চালায়।

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

খেলাফত আন্দোলনের পাশাপাশি যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়, তখন সরকারী অফিস-আদালত থেকে শুরু করে সরকার পরিচালিত স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা সব শূন্য হতে শুরু করলো। অসহযোগ আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য মওলানা মাদানী যে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তা ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবজনক অধ্যায় হিসাবে ভাস্বর হয়ে থাকবে। তিনি 'রিসালা-এ তরকে মুয়ালাত" নামে একখানা তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ পুস্তিকা রচনা করে ইংরেজদের ব্যাপারে উত্তেজিত ভারতবাসীর জেহাদী আগুনকে অধিক প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। পুস্তকটি এতই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে, শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তা বাজেয়াফত করতে বাধ্য হয়। তাতে মওলানা মাদানী যুক্তি প্রমাণ ও শরীয়তের হুকুম-আহ্কামের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, বৃটিশ শক্তি তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক শক্তি-কেন্দ্র তুর্কী খেলাফতের মূলোৎপাটন করতে বদ্ধপরিকর। যারা মিসর, হেজাজ বিশেষতঃ মক্কা-মদীনা ভূমির উপর নানা ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করে নির্যাতন ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে, যারা আরব জাহানের বিষফোঁড়া ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে, যারা মুসলিম জাহানের মেরুদণ্ড তুরস্ক সাম্রাজ্যকে আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়ে খন্ড-বিখন্ড করেছে, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা ইসলামী শরীয়ত বিরোধীই নয়, মানবতা বিরোধীও বটে। বলাবাহুল্য, মওলানার এই পুস্তক বৃটিশ-ভারতে ইংরেজদের ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে তোলে।

করাচীর মোকদ্দমা ও মওলানা মাদানী

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান সম্বল ছিল ভারতের জনবল ও সম্পদ। তুর্কী খেলাফতের অধীন মক্কা মদীনার পবিত্র ভূমিকা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলার জন্য যে বৃটিশ সামরিক শক্তি ব্যবহৃত হয়েছিল, তাতে সৈন্য সংগ্রহ

করা হয়েছিল প্রধানতঃ ভারত থেকেই। এতে করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা প্রকারান্তরে মুসলিম সেনাবাহিনী দ্বারাই তুরস্ক, সাইপ্রাস এবং সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যের আরব মুসলমানদের বুকে গুলী বর্ষণ করাচ্ছিল। মুসলমানদেরকে দিয়ে কুচক্রী সাম্রাজ্যবাদীদের চালিত জগৎজোড়া মুসলিম নিধনের এই ন্যাক্কার-জনক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানরা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৮, ৯ ও ১০ই জুলাই তারিখে করাচীতে 'নিখিল ভারত খেলাফত কমিটি'র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মওলানা মাদানী এই প্রস্তাব উত্থাপন করলেন যে,-

"যে কোনো মুসলমানের পক্ষে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীতে চাকুরী করা বা চাকুরীকে উৎসাহিত করা সম্পূর্ণ হারাম। বৃটিশ সৈন্যবাহিনীতে কর্মরত সকল মুসলিম সৈনিকের নিকট একথা পৌঁছিয়ে দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।"

সম্মেলনে মওলানা মাদানীর এই বিপ্লবাত্মক প্রস্তাবটি বিপুল উত্তেজনাপূর্ণ সাড়ার মধ্য দিয়ে গৃহীত হয় এবং মুহূর্তের মধ্যে সারা ভারতে একথা ছড়িয়ে পড়ে। মওলানা মাদানীর এ প্রস্তাবকে প্রকাশ্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে বৃটিশ সরকার ঘোষণা করে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০, ১৩১ ও ৫০৫ ধারা মতে মওলানা মাদানী ও মওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার, মওলানা শওকত আলী, ডক্টর শায়ফুদ্দীন কিচ্‌লু, মওলানা নিসার আহমদ কানপূরী, পীর গোলাম মুজাদ্দিদ সিন্ধী ও স্বামী শঙ্কর আচার্যের বিরুদ্ধে এক রাষ্ট্রদ্রোহিতা মূলক মোকদ্দমা দায়ের করে।

মওলানা মাদানীর গ্রেফতারী

নিখিল ভারত খেলাফত কমিটির সম্মেলন সমাপ্ত হওয়ার পর মওলানা মাদানী করাচী থেকে দেওবন্দ চলে যান। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ১৮ই সেপ্টেম্বর তাঁর নামে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হয়। মাদানীর গ্রেফতারী পরওয়ানার কথা প্রচার হওয়া মাত্র সমগ্র দেওবন্দ শহরে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত হয় এবং অল্পক্ষণের মধ্যে হাজার হাজার লোক তাঁর বাসভবনে এসে জামায়াত হয়। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ জনতার সংঘর্ষের আংশকায় সরকার তাৎক্ষনিক ভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে, পরদিন শহরবাসী শোভাযাত্রা সহকারে মওলানাকে ষ্টেশনে পৌঁছিয়ে দেবে। কিন্তু গভীর রাত্রে দেখা গেলো, একদল গুর্খা ও কতিপয় গোরা পুলিশ কর্মচারী এসে তাঁর বাসভবন ঘিরে ফেলে এবং রাত ৩টার সময় তাঁকে গ্রেফতার করে স্পেশাল ট্রেনে করে নিয়ে যায়। তাতে পরদিন আবার তার গ্রেফতারির প্রতিবাদ ও মুক্তির দাবীতে অন্যান্য শহর সমেত ক্ষুব্ধ জনতা স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালন করে।

আসামীর কাঠ গড়ায় মওলানা মাদানী

১৯১২ খৃঃ ২৬শে ডিসেম্বর করাচীর খালেকদিনা হলে এই ঐতিহাসিক মোকদ্দমার শোনানী শুরু হয়। আইনগত দিক থেকে এ মোকদ্দমায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ফাঁসি অথবা

আজীবন নির্বাসন হবার কথা। হলের গোটা পরিবেশকে বিভীষিকাময় করে তোলা হয়েছিল। দেড় শত সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এবং হলের চার পাশে ছিল কাঁটাতারের বেড়া। করাচী শহরের সর্বত্র বৃহদাকারের দণ্ডধারী পুলিশের তৎপরতা। বেলা দশটার দিকে আড়াই শত অস্ত্রধারী সৈন্য কামান গোলা নিয়ে হলের পেছনে মোতায়ন। ঐ সময় যে-কোনো ব্যক্তির মনে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। মওলানা মাদানী প্রমুখ আলেমকে এই বিভীষিকাময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে হলে আনা হলো। কিন্তু যাদের উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার এই ভীতিপ্রদ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলো তাঁরা এসবকে শিশুর ক্রীড়া-কৌতুকের ন্যায় মনে করলেন। তাঁদের সংগ্রাম ছিল ন্যায় ও সত্যের। এসব সিংহদিল মোজাহিদ তার কিছুই পরওয়া করেননি। তাঁরা এটা স্পষ্টই জানতেন যে, যদি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁদেরকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলায়, তাতে তাঁরা শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করবেন এবং জাতি পাবে সত্যনিষ্ঠার প্রেরণা; আর এমনিভাবে ভারতের আজাদীর পথ কাফের বিরোধী জেহাদে দ্রুত রূপান্তরিত হবে।

নেতৃবৃন্দ মোকদ্দমায় কোন প্রকার আইনজীবি নিযুক্ত করেননি। মওলানা মাদানী ও তাঁর সহকর্মী মওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার ইংরেজ আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যেই নির্ভীক ও অনলবর্ষী ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে এই ষড়যন্ত্রমূলক মোকদ্দমার রহস্যই কেবল ফাঁস হয়ে যায়নি, এর দ্বারা পাক-ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূলও কেঁপে উঠে। করাচীতে ইংরেজ কাঠ গড়ায় মওলানা মাদানী ও মওলানা জাওহারের সে-সব অনলবর্ষী বক্তৃতা উপমহাদেশের আজাদী সংগ্রামের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

আদালতে মওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহারের ভাষণ

"যে প্রস্তাবকে বৃটিশ সরকার রাজদ্রোহ বলে অভিযুক্ত করছে, এটা এমন এক মহাপুরুষের আনীত প্রস্তাব, যাঁকে আমি শ্রদ্ধেয় মুরব্বি হিসাবে গ্রহণ করতে গৌরব বোধ করি। তিনি হচ্ছেন হযরত মওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী। "ইংরেজ সরকারের পুলিশ ও সৈন্য বিভাগে মুসলমানদের যোগদান হারাম এবং শরীয়ত নিষিদ্ধ" বলে ফতওয়া ও বিজ্ঞপ্তি সামরিক অফিসার সিপাহীদের নিকট প্রচারিত হচ্ছে জেনে আমার অন্তর আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে।"

মওলানা মাদানীর ভাষণ

"অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায় ও সত্য কথা বলাই উত্তম জেহাদ" –এই হাদীসের মর্ম বাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত মওলানা মাদানী আদালতের সামনে যেই নির্ভীক ভাষণ দিয়েছিলেন তা হলো:

"আমি একজন ধর্মানুরাগী ব্যক্তি হিসাবে আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের হাদীসের প্রতি রয়েছে আমার অটল ঈমান ও পূর্ণ আস্থা। 'কেউ ধর্মীয় কাজে বাধার সৃষ্টি করলে কোনোরূপ পরওয়া না করেই তা প্রতিহত করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।' মহানবীর নির্দেশ হচ্ছে: কোনো শাসক বা রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার তখনই জায়েজ, যদি তাতে আল্লাহর অবাধ্যতা না থাকে। এমন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অধীনে থাকা বা তার আদেশ পালন করা অবৈধ, যারা বা যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশের বিরোধী শাসনকার্য চালায়। ধর্মীয় আলেম হিসাবে সাধারণ মানুষের তুলনায় আমার প্রতি আল্লাহ-রসুলের প্রত্যেকটি হুকুম তামিল করা এবং অন্যের নিকট প্রচার করা অধিকতর কর্তব্য। ধর্মীয় গ্রন্থে রয়েছে, যে ব্যক্তি সত্য গোপন করবে কেয়ামতের দিন তাকে দোযখের জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। কুরআন পাকে কাফের সম্পর্কে কঠোর আযাবের কথা উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু যে মুসলমান অপর মুসলমানকে হত্যা করে, তার জন্যে পাঁচ প্রকারের শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। "........বর্তমান পরিস্থিতিতে ইংরেজ সরকারের পুলিশ বা সৈন্য বিভাগে যোগদান করলে তাকে বাধ্য হয়ে অপর মুসলমানকে হত্যা করতে হয়। তাই আলেম সমাজ ইংরেজ সৈন্যবাহিনীতে কোনো মুসলমানের যোগদান করাকে হারাম বলে ফতওয়া জারী করেছেন। ইসলাম ধর্মমতে এটা হচ্ছে তাদের অপরিহার্য ধর্মীয় দায়িত্ব। সুতরাং করাচী সম্মেলনে যে প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে, সেটা নতুন কিছু নয় বরং তেরশো বছর পূর্বেকার একটি বিশেষ ধর্মীয় অনুশাসনেরই অভিব্যক্তি মাত্র।"

"মিঃ লয়েড জর্জ ও মিঃ চার্চিল যখন এ ঘোষণা করেছেন যে, তুর্কী খেলাফতের সঙ্গে তাদের যেই যুদ্ধ, সেটা ক্রুসেডের ধর্ম যুদ্ধ, ইসলাম খৃষ্টধর্মের মধ্যে শেষ বুঝা-পড়ার যুদ্ধ, তখন মুসলমানদের পক্ষে ইসলাম বিরোধী সকল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা প্রধান ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"উল্লেখ্য যে, এই ধর্মীয় উত্তেজনার ফলেই ১৮৫৭ সালে সারা ভারতের সর্বত্র যখন বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছিল, তখন রানী ভিক্টোরিয়া অর্থাৎ ইংরেজ সরকার ভারতীয়দেরকে যে প্রতিশ্রুতি ও সরকারী ঘোষণা প্রচার করে তাদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, তাতে উল্লেখ ছিল যে, "কারও ধর্মের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে না বরং ধর্মীয় বিষয়ে দেশবাসীর পূর্ণ আজাদী থাকবে।" বৃটিশ পার্লামেন্টেও তা স্বীকৃত হয়েছিল। এমনকি পরবর্তীকালে সপ্তম এডওয়ার্ড এবং পঞ্চম জর্জও এ ঘোষণা সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান সরকার যদি রানী ভিক্টোরিয়া, পরবর্তী সম্রাটগণ ও তাদের পার্লামেন্টের প্রতিশ্রুতি ও ঘোষণার কোনো মর্যাদা না দেন আর ভারতবাসীর ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপকে সঙ্গত মনে করেন, তা হলে এদেশের কোটি কোটি

মুসলমানকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, তারা মুসলমান হিসাবে বেঁচে থাকতে চায়, না নিরেট ইংরেজ বশংবদ প্রজা হিসাবে। ভারতের তেত্রিশ কোটি হিন্দুকেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অবশ্য আমি মুসলমানদের তরফ থেকে ইংরেজ সরকারকে সতর্ক করে দিতে চাই, যদি সরকার ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে, তা হলে মুসলমানরা নিজের ধর্ম রক্ষার খাতিরে জীবন উৎসর্গ করে দিতেও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করবে না। আর এ জন্য আমিই সর্বাগ্রে জীবন উৎসর্গ করতে এগিয়ে আসবো।"

এ সময় মওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার শ্রদ্ধাভরে মওলানা মাদানীর পদচুম্বন করে তাঁর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি প্রদর্শন করেন।

অতঃপর ১৯২১ সালের ১লা নভেম্বর এই ঐতিহাসিক মোকদ্দমার রায় প্রকাশিত হয়। মওলানা মাদানী ও তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ শেষ পর্যন্ত তাদের ক্ষুরধার যুক্তির সামনে বাতিল হয়ে যায়। এসত্ত্বেও অপর কয়েকটি অভিযোগের অজুহাতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৫ ও ১০৯ ধারা মতে হযরত মওলানা মাদানী ও তাঁর সহকর্মীদেরকে দু'বছর করে সশ্রম কারা দণ্ডের হুকুম দেয়া হয়।

করাচীর মোকদ্দমা চলা কালে দেশব্যাপী উত্তেজনার আগুন প্রজ্জ্বলিত ছিল। যে সত্যের বাণী উচ্চারণ করে মুসলিম ভারতের সংগ্রামী নেতাগণ ইংরেজ নির্যাতনের লৌহ প্রাচীরের অন্তরালে নিষ্পেষিত হচ্ছিলেন, দেশবাসী তা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিল এবং প্রতিক্রিয়া হিসাবে সারা দেশে সভা, শোভাযাত্রা ও হরতাল পালিত হয়। মূলত: এমনিভাবেই উপমহাদেশের আজাদী আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হতে থাকে। জেলে অবস্থান রত মওলানা মাদানীর কাছে তাঁর সহকর্মীদের পক্ষ থেকে অসংখ্য চিঠিপত্র যেতো, সে সব চিঠিপত্রের জবাব হিসাবে মওলানা সাহেব যে জ্ঞানগর্ভ ও জ্বালাময়ী কথাবর্তা লিখতেন, সেগুলোর সংকলন "করাচীর চিঠি" হিসাবে প্রসিদ্ধ। (হায়াতে মাদানী)

মুরাদাবাদ ও নৈনিতাল কারাগারে মওলানা মাদানী

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলা কালে যখন বৃটিশ সরকার বিপক্ষের উপর্যুপরি আক্রমণের ফলে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং মর্মে মর্মে অনুভব করে যে, ভারতের সঙ্গে একটা বুঝা পড়া করা না হলে উপায় নেই, তখন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্টাফোর্ড ক্র্যাপসের নেতৃত্বে 'ক্র্যাপস মিশন' ভারতে প্রেরিত হয়। এ সময় ভারতের বিভিন্ন পার্টির মধ্যে এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মতভেদ ভীষণ এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তখন মওলানা মাদানী সমঝোতার উদ্দেশ্যে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় দৃষ্টি ভঙ্গিতে সূক্ষ্মতত্ত্ব সন্নিবেশিত প্রমাণাদি দ্বারা দ্বিজাতিতত্ত্ব ও এক জাতিতত্ত্বের সমস্যার সমাধানের অবতারণা করে যে

ফর্মূলা পেশ করেছিলেন, উক্ত মিশন তাতে স্তম্ভিত হয়ে যায়। তারা মওলানা মাদানীর অগাধ রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতি, জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। পরে মওলানার এই ফরমূলা "মাদানী ফরমূলা" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানান কারনে উক্ত মিশন ব্যর্থ হলে পুনরায় আজাদী আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে এবং পূর্বাপেক্ষা অধিক জোরেশোরে ভারতের সর্বত্র এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। তখন দিশেহারা ইংরেজ সরকার বলপূর্বক ভারতের আন্দোলন দমন করার জন্য গভর্ণর জেনারেল মি. এমেরী ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মি. চার্চিল একটি যুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং মওলানা মাদানীকে এ প্রেক্ষিতে গ্রেফতার করার বাহানা খুঁজতে থাকেন। কেননা মওলানা মাদানীর ব্যক্তিত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদীদের ভারত থেকে বিতাড়িত করার মরণপণ সংগ্রামী নেতা হিসাবে মাদানী সম্পর্কে তারা খুব ভালভাবেই সচেতন ছিলেন। অতঃপর ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ২৩, ২৪ ও ২৫শে এপ্রিল তারিখে মুরাদাবাদে অনুষ্ঠিত জেলা জমইয়তে ওলামায়ে হিন্দের কন্‌ফারেন্সে মওলানা মাদানীর বক্তৃতাকে উপলক্ষ করে তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা সাজানো হয় এবং গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করা হয়। কনফারেন্স শেষে মওলানা সাহেব দেওবন্দ পৌঁছে যান। সেখানে গ্রেফতার করা নিরাপদ মনে না করে তাঁকে পাঞ্জাব ইত্তেহাদ কনফারেন্সে যাওয়ার পথে দেওবন্দ ও ছাহারানপুরের মধ্যবর্তী তিলছড়ী ষ্টেশনে রাত দুটার সময় গ্রেফতার করা হয়। মওলানা মাদানীর এ গ্রেফতারীর পর প্রথম মুরাদাবাদে ও পরে এলাহাবাদের নৈনিতাল জেলে তাঁকে বহুদিন কারা রুদ্ধ করে রাখা হয়।

মওলানা মাদানী পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অনেক সময় উদ্দীপনাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত খেলাফত কন্‌ফারেন্সে সভাপতির ভাষণ দান কালে তিনি আন্দোলন সম্পর্কিত যে ভাষণ দিয়েছিলেন, এখানে তার কিছু অংশ পেশ করা হলোঃ

রক্তের বদলে ভারতের ভাগ্য

"......হে ভারত! ফ্রান্সের ময়দানে, ইটালীর পাহাড় পর্বতে, সালুনিকার মাঠে-ঘাটে, দারাদানিয়ালের প্রস্তর ভূমিতে, সিনাই উপত্যকা এবং সুয়েজ ও সিরিয়ার বালুকা প্রান্তরে, এডেন ও ইয়ামনের কঙ্কর ভূমিতে, ইরাক, ইরানের মাঠে-ময়দানে, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকার জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে, মধ্য এশিয়া ও কাককাজিয়ার তুষার ভূমিতে এবং কৃষ্ণ সাগর, লোহিত সাগর ও শ্বেত সাগরের উপকূলসমূহে বন্য পশু ও জন্তুর ন্যায় অতীব নির্দয়ভাবে তোর লক্ষ লক্ষ কচি সন্তানের রক্তের স্রোত প্রবাহিত করা হচ্ছে, তাদের উপর গোলা বর্ষণ চলছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ অস্ত্রাঘাতে দুনিয়া থেকে বিদায়

নিচ্ছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি হে ভারত! এর বিনিময়ে তোকে কি পুরস্কার দেওয়া হলো? উত্তরে এছাড়া তোর আর কি বলার আছে যে, এর পুরস্কার স্বরূপ তোর ভাগ্যে জুটেছে স্ত্রীদের বৈধব্য, সন্তানদের এতীম হওয়া, তোর গলায় দাসত্বের শৃংখল পরানো, রাওলেট বিল পাশ হওয়া, কোর্ট মার্শালের কবলে পড়া, পাঞ্জাবের দিকদিগন্তকে রক্তে রঞ্জিত করা, জালিনওয়ালাবাগে মিশিন গানের বর্ষণ, তোর নিরিহ সন্তানদের উপর পাশবিক অত্যাচার ও অপমানজনক ব্যবহার, তোর স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া, তোর উপর নানাবিধ টাক্স বসানো, তোকে রাজদ্রোহিতার নানারূপ ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে শৃঙ্খলিত করা।"

"ভাইসব, এ সমস্ত কি কারণে সম্ভব হচ্ছে তা আপনারা চিন্তা করেছেন কি? আমাদের অনৈক্য এবং বিদেশীদের সঙ্গে আমাদেরই এক শ্রেণীর লোকের অবৈধ মৈত্রী সহযোগিতার কারণেই এসব সম্ভব হচ্ছে। আজ যদি আমরা গোটা ভারতবাসী ঐক্যবদ্ধ হই, পৃথিবীর কোনো শক্তি আমাদের প্রতি চোখ তুলে তাকাবার সাহস পাবে না। আমাদের ঐক্যশক্তির কাছে তাদের গোলা-বারুদ নিক্রিয় হতে বাধ্য। .....আমাদের মতবিরোধে কেবল আমাদেরকেই বিপদে পড়তে হবে না বরং এর ফলে গোটা প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ ও জাতির স্বাধীনতাও বিপন্ন হয়ে পড়বে।" –(হায়াতে মাদানী)

আজাদী অর্জন ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দারুল উলুম দেওবন্দকে কেন্দ্র করে শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভীর অনুসারীদের যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, এই সঙ্গে উপমহাদেশের প্রায় সকল শ্রেণীর আলেমই জড়িত ছিলেন। এ আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন আরও অসংখ্য নির্যাতিত আলেম রয়েছেন, যাদের সুদীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ করা এখানে সম্ভব নয়। তাদের মধ্যে মওলানা হাসরাৎ মোহানী, মওলানা আজাদ সোবহানী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা আতাউল্লা শাহ বুখারী, মওলানা মহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, মওলানা ওজাইর গুল পেশোয়ারী, মওলানা ওয়াহীদ আহমদ, মওলানা আবদুল রহীম রায়পুরি, মওলানা মুহাম্মদ সাদেক, মওলানা শেখ আবদুল রহীম, প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম।

আজাদী আন্দোলনে বাংলা দেশ থেকে যেসব আলেম জড়িত হয়ে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে মওলানা মনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী, পীর বাদশা মিয়া, মওলানা আকরাম খাঁ, মওলানা আবদুল্লাহিল কাফীও ও মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী, মওলানা অতহার আলী, মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের নাম উল্লেখযোগ্য।

এসব সংগ্রামী ওলামা কেবল রাজনৈতিক সংগঠন, বক্তৃতা ও তৎপরতার দ্বারাই আজাদী আন্দোলন পরিচালনা করেননি, সাহিত্য, সাংবাদিকতার মাধ্যমেও তাদের

ক্ষুরধার লেখনী সমানে চালিত হয়েছিল। আজাদী আন্দোলনের নির্ভীক সেনানী বিপ্লবী নেতা মওলানা মুহাম্মদ আলী কর্তৃক কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজী পত্রিকা "দি কমরেড" ও দিল্লী থেকে প্রকাশিত উর্দু দৈনিক "হামদর্দ" সারা দেশে জেহাদের আগুন ছড়িয়ে দিয়ে ছিলো। মওলানা মনীরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো 'সুলতান' ও 'আল-ইসলাম'। এ ছাড়া তিনি অনেক পুস্তকও এই মর্মে রচনা করেন। মওলানা জাফর আলী খানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো 'জমিনদার' পত্রিকা। মওলানা আবুল কালাম আজাদের পাণ্ডিত্য পূর্ণ বক্তৃতা ও ক্ষুরদার লেখনীর কথা উপমহাদেশের কে না জানে। উর্দু ভাষায় প্রকাশিত 'আল-হেলাল' ও 'আলবালাগ' পত্রিকায় তাঁর উত্তেজনাপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ লেখা মুসলমানদের অন্তরে ঈমানের দীপশিখা ও বৃটিশ সরকার বিরোধী আগুন জ্বালিয়ে দিতো।

বস্তুতঃ ইংরেজদের ব্যাপারে কারও কারও অনুসৃত নীতির ফলে এক শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে ইংরেজ আনুগত্যের যে ভাব সৃষ্টি হয়েছিল, এসব মুসলিম মনীষি ও আজাদী আন্দোলনের বীর সেনানী অনলবর্ষী বক্তৃতা ও লেখা বৃটিশ সরকারের প্রতি সে সব পরাজিত মনোভাবের মুসলমানদের আনুগত্যেরও পরিসমাপ্তি ঘটায়। আর তাই ঐ সকল লোকও মওলানা মুহাম্মদ আলীর অনুসরণে পরবর্তী পর্যায়ে এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

নাদওয়াতুল মুসান্নেফীন

ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা ও সংস্কৃতিকে ভারতের বুকে অক্ষুন্ন রাখা এবং তার প্রচার ও প্রসার দানের ক্ষেত্রে দারুল উলূম দেওবন্দের আর এক অবদান হলো দিল্লীর 'নাদওয়াতুল মুসান্নেফীন' প্রতিষ্ঠানটি। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন মফতী আতীকুর রহমান, ফাজেলে দেওবন্দ। এটি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সেবা ক্ষেত্রে উপমহাদেশের একটি অতুলনীয় প্রতিষ্ঠান। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতগণ অধিকাংশই দেওবন্দে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। এ প্রতিষ্ঠান ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণামূলক বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করে উপমহাদেশে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বদানে বিরাট অবদান রাখে।

এভাবে কংগ্রেসেরও বহু আগে থেকে অবিভক্ত ভারতের মুসলমানরা ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে যখন নানান ঘাত-প্রতিঘাত ও বাধাবিপত্তির মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আজাদী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁদের সঙ্গে গঠিত হিন্দু প্রভাবিত ভারতীয় কংগ্রেসও এক যোগে আন্দোলনে জড়িত ছিল।

মূলতঃ খেলাফত আন্দোলনের পর কংগ্রেসই ছিল ভারতের আজাদী আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই অসহযোগ আন্দোলন পরিচালিত হয়। কিন্তু মুসলমানদের প্রতি হিন্দু নেতাদের বিমাতা-সুলভ মনোভাব, পদে পদে মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে মুসলমানদেরকে হজম করে নেওয়ার প্রবণতা এবং তাঁদেরকে রাষ্ট্রীয় জীবনে সকল ক্ষেত্রে কোনঠাসা করার দুরভিসন্ধি প্রভৃতি সংকীর্ণতার কারণে অধিকাংশ মুসলিম নেতা হিন্দু মুসলমানের এ ঐক্য সংস্থাটিতে মুসলমানদের টিকে থাকার ব্যাপারে সন্দিহান হন। বাস্তবেও তাই ঘটে, পৌনপুনিক হিন্দু নেতৃত্বের সংকীর্ণ মানসিকতার বহিঃপ্রকাশে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ১৯০৬ সালে গঠিত মুসলমানদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগে এসে তারা ক্রমে যোগদান করতে থাকেন। তবে তখনও কংগ্রেসে বহু প্রভাবশালী মুসলমান নেতা থেকে যান।

জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ গঠন (১৯১৯ ইং)

সকল আলেম এ যাবত আজাদী সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁরা দেখতে পেলেন যে, বর্ণিত দু'টি রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র বিশেষ করে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের মধ্যে তাদের সেই মূল লক্ষ্য শামিল নেই, যা ১৮০৩ খৃঃ শাহ আবদুল আজীজ দেহলভী তাঁর বিপ্লবী ফতওয়ার মাধ্যমে মুসলিম ভারতের জন্যে নির্দেশ করে গিয়েছিলেন আর যে জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন বালাকোটের বীর শহীদান। তাই অবিভক্ত ভারতের আলেমগণ উপমহাদেশের মুসলমানদের ইসলামী নেতৃত্ব দানের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর "জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ" নামক একটি সর্ব ভারতীয় ওলামা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। উল্লেখিত তারিখে অমৃতশ্বরে মওলানা আবদুল বারী ফিরিঙ্গি মহল্লীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ওলামা সম্মেলনে জমিয়তে ওলামা-ঈ -হিন্দ গঠিত হয়।

যুক্ত-জাতীয়তা ও বিনা শর্তে কংগ্রেসকে সমর্থনের প্রশ্ন দেখা দেয়ার আগ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারতের প্রায় সকল শ্রেণীর আলেমই জড়িত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, এই ওলামা সম্মেলনেই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২৮ শে ডিসেম্বর ১৯১৯ ইং সালেই এক দিকে যেমন অমৃতশ্বরে মওলানা শওকত আলীর সভাপতিত্বে খেলাফত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তেমনি হাকীম আজমল খানের সভাপতিত্বে মুসলিম লীগ এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

আলেমরাই কংগ্রেসের দশ বছর আগে ভারত স্বাধীনের প্রস্তাব নেন

জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ কর্তৃক সর্বপ্রথম ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর প্রথম ভারত স্বাধীনতার দাবী তোলার দশ বছর পর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। জমিয়তের প্রস্তাবের ১৭ বছর পর ১৯৩৬ সালের ১৭ই অক্টোবর মরহুম কায়েদে

আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে লাক্ষ্মৌতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে ভারত স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। অনেকেই ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা বশতঃ মনে করে থাকেন যে, কংগ্রেসই বুঝি আজাদীর চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রথম ভারত স্বাধীনতার প্রস্তাব নিয়েছিল।

সত্য কথা এই যে, ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘোষণা হয়েছিল মূলতঃ ১৮০৩ খৃঃ শাহ আবদুল আজীজের বিপ্লবী ফতওয়ার আহবান দ্বারা, আর ভারতের সেই স্বাধীনতা প্রস্তাবেরই রক্তক্ষয়ী দৃশ্য দেখা গেছে ১৮৩১ খৃঃ বালাকোটের ময়দানে, যা আলেমদের একক ত্যাগের বিনিময়েই সংঘটিত হয়েছিল। অতঃপর ওলামায়ে কেরামই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর ভারতবাসীকে ইংরেজের কবল মুক্ত করার জন্যে আজাদীর প্রথম আনুষ্ঠানিক দাবী তোলেন। এভাবে দেড়শো বছর পূর্বে উপমহাদেশের মুসলিম আলেম সমাজ আজাদী আন্দোলনের যেই বীজ বপন করেছিলেন এবং বুকের তপ্তাজা খুন দিয়ে যাকে সিক্ত করেছিলেন, সেই বীজই শেষ পর্যন্ত পত্র-পল্লবে সুশোভিত হয়ে ফল দানের উপযোগী হয়।

ভারতের বিজনূর থেকে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের মুখপত্র "দৈনিক আলজমিয়ত" এবং অর্ধ সাপ্তাহিক "মদীনা" ওলামা সমাজ ও মুসলমানদের মধ্যে আজাদী আন্দোলন, ইসলামী জেহাদ ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রেরণা যোগায় এবং এগুলোকে কেন্দ্র করে বহু আলেম সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের সৃষ্টি হয়। যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রতিবন্ধক ছিলো পরাধীনতা, তাই সর্বপ্রথম পরাধীনতার জিঞ্জির ছিন্ন করাকেই তারা অগ্রাধিকার দেয়। ফলে একই লক্ষ্যের অন্যান্য সংগঠনের সাথেও তারা যোগ দেয়। আলেম সমাজের কেউ কেউ ইংরেজ শাসন উচ্ছেদকামী তাঁদের একক প্রতিষ্ঠান 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' ছাড়াও অভিন্ন লক্ষ্যের অভিসারী কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে থাকেন।

মওলানা আকরাম খাঁ

মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক, রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা আকরাম খাঁ তখন তাঁর সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, মাসিক মোহাম্মদী ও দৈনিক আজাদের মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুরাগ সৃষ্টি ছাড়াও তাঁর ক্ষুরধার লেখনী দ্বারা এদেশবাসীকে আজাদী পাগল করে তুলেছিলেন। মূলত ঃ এজন্যই বলা হয় যে, মওলানা আকরাম খাঁ ও তাঁর আজাদ পত্রিকা না থাকলে বাংলাদেশ পাকিস্তান হতোনা বরং পশ্চিম বাংলার মতোই কোটি কোটি মুসলমানের এ দেশটিকে ভারতের গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকতে হতো। আজ যে সকল কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক মওলানা আকরাম খাঁর আদর্শকে বক্র দৃষ্টিতে দেখেন এবং বামপন্থী সংস্কৃতির অনুশীলন দ্বারা ধিকৃত চিন্তায় সুখপান, তাদের অনেকেই আজাদী আন্দোলনের বীর সেনানী এই মওলানা সাংবাদিকের কাছে ঋনী।

উপমহাদেশের বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ চিন্তা মওলানা আক্রাম খাঁর মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাঁর কর্মবহুল জীবনই এর জ্বলন্ত

স্বাক্ষী। দেশবাসীর সার্বিক কল্যাণের জন্য আজাদীকে তিনি প্রথম ও প্রধান শর্ত করে দিয়েছিলেন। এজন্যই তিনি পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য অকুতোভয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। শিক্ষা-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সকল দিক থেকে অনগ্রসর মুসলমানদের কল্যাণ চিন্তায় ঐ সময় অনেকেই এগিয়ে এসেছেন বটে কিন্তু এজন্যে জাতীয় জাগরণ সৃষ্টিতে তাঁর অবদান সর্বোচ্চ। কেননা তাঁর দ্বারাই বাংলার ঘরে ঘরে আজাদী পাগল মানুষের কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনের বাণী অধিক পৌঁছেছিল। তাঁর নির্ভীক ভূমিকার ফলে তিনি ইংরেজদের রোষ দৃষ্টির সম্মুখীন হয়ে কারাগারেও নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। হিন্দু নেতৃবৃন্দ মুসলমানদেরকে "আরবের খেজুর গাছের তল থেকে আগত" বলে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং মুসলমানদেরকে ভারত থেকে সম্পূর্ণ উৎখাত করার জন্য সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। এর অনুকূলে বহু অযুক্তি কুযুক্তির অবতারণা করে তারাই ভারতের একচ্ছত্র মালিক বলে নিজেদের প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাতো। মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বিভিন্ন যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্যে তাদের যাবতীয় কূটযুক্তির জাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিতেন। মওলানা সাহেব খিলাফত, অসহযোগ আন্দোলন সহ এ দেশের প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গেই সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিলেন। মুসলমান প্রজাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য তিনি "বঙ্গ প্রজা সমিতি" গঠন করেছিলেন। হতাশাগ্রস্থ মুসলমানদের মধ্যে আত্মজাগৃতি সৃষ্টি করতে হলে তাদের চিন্তা দুয়ারের কড়া প্রথম নাড়া দিতে হবে, মওলানা আকরাম খাঁ তা হাঁড়ে হাঁড়ে উপলব্ধি করেছিলেন। এজন্যই তিনি লেখনীর অস্ত্রকে অধিক প্রাধান্য দিয়ে প্রথমে 'সেবক' 'আলইসলাহ' উর্দু দৈনিক 'জামানা' পত্রিকা বের করেন। সেবক পত্রিকায় "অগ্রসর! অগ্রসর!!" শিরোনামায় উত্তেজনাপূর্ণ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখায় তাঁকে গ্রেফতার হতে হয় এবং পত্রিকার জামানত তলব করা হয়। মওলানা আকরাম খাঁ কলম যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা বাগ্মীতায়ও অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর যুক্তিপূর্ণ অনলবর্ষী বক্তৃতা শ্রোতাদের অন্তরে সহজেই প্রভাব বিস্তার করত। মওলানা আকরাম খাঁও অন্যান্যদের মত সর্ব প্রথম কংগ্রেসেই ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের প্রাদেশিক সভাপতি হিসাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের শক্তিকে অধিক বৃদ্ধি করেছিলেন। মূলতঃ ঐ সময়ই হিন্দু নেতাদের মুসলিম স্বার্থ বিরোধী মানসিকতার সঙ্গে তাঁর সঠিক পরিচয় ঘটে। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই মওলানা আক্রাম খাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে।

এক মওলানা নেতাই ভারত স্বাধীনতার প্রস্তাবক ছিলেন

কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে ১৯৩৬ খৃঃ লক্ষ্ণৌয় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে মওলানা আক্রাম খাঁ যোগদান করেছিলেন। মুসলিম লীগের ঐ অধিবেশনেই প্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাবও এক মওলানা নেতাই উত্থাপন করেছিলেন। তিনি হলেন মওলানা হাসরাৎ মোহানী। "উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে কংগ্রেসের এক অধিবেশনে মওলানা হাসরাৎ মোহানী ভারতের

পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর বিরোধিতায় তাঁর সে দাবী নাকচ হয়ে যায়। কেননা কংগ্রেস তখন পর্যন্ত ডোমিনিয়ন স্টেটাসের দাবী নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল। অবশ্য মুসলিম লীগের অধিবেশনে গৃহীত হওয়ার পরবর্তী কালে কংগ্রেসের এক অধিবেশনে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী গৃহীত হয়। (অতীত দিনের স্মৃতি পৃঃ ১৭১ দ্রঃ)

মওলানা আকরাম খাঁ মুসলিম লীগে যোগদান করে এর সাংগঠনিক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তিনি সভাপতি ছিলেন। অপর দিকে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আজাদীর পরও তিনি দীর্ঘদিন মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। মওলানা আকরাম খাঁ অবিভক্ত 'পাকিস্তান গণপরিষদ' ও 'তালীমাতে ইসলামিয়া বোর্ডের' সদস্য ছিলেন। ৬০-এ দশকে আইয়ুব সরকারের আমলে তিনি 'ইসলামী উপদেষ্টা পরিষদের' অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৫৪ সালে এই সংগ্রামী নেতা সক্রিয় রাজনীতি হতে দূরে সরে এলেও তাঁর কলমের সংগ্রাম আজাদ পত্রিকা মারফত অব্যাহত থাকে। এই বৃদ্ধলে নেমে নেতৃত্ব দিয়ে তার প্রতিবাদ করেছিলেন। বার্ধক্যের ক্লান্তিকে উপেক্ষা করে সংগ্রামী নেতা আইয়ুব আমলে সংবাদ পত্রের কণ্ঠ রোধের প্রতিবাদে রাস্তায় মিছির সাথেক পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ ব্যথা বুকে নিয়ে তিনি জীবনের চরম অবস্থায় পৌঁছেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভা কায়েদে আজমকে মুগ্ধ করেছিল। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব নেওয়ার সময় থেকে ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত আজাদী সংগ্রামের এক নির্ভীক সিপাহ্‌সালার ছিলেন মওলানা আকরাম খাঁ। তিনি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে 'বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের' সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ সময় তিনি মুসলিম স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ চেষ্টা করেন।

"বন্দে মাতরম" ও মওলানা আক্রাম খাঁ

মুসলিম জাতীয়তা বোধের বিকাশ দানে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মওলানা আকরাম খাঁ যেই বিরাট কাজ করেছেন তার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত থেকে তা সহজে অনুমেয়। জাতীয়তাবোধ তীব্রতর হওয়ার মধ্য দিয়েই মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের দাবী জোরদার হয়েছিল। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন, ব্যাঙ্গল প্যাক্ট ইত্যাদির ভিতর দিয়ে মুসলমানদের ব্যাপারে হিন্দু নেতাদের বিরূপ মনোভাবের দরুণ মুসলমানের জাতীয়তাবোধ অনেক বৃদ্ধি পায়। তবে তা অধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল "বন্দে মাতরম " সঙ্গীত ও "শ্রপদ্ম" প্রতীককে কেন্দ্র করে। "কংগ্রেস রাজনীতির ক্ষেত্রে 'বন্দে মাতরম'কে জাতীয় সংঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এর রচয়িতা ছিল বিখ্যাত মুসলিম বিদ্বেষী লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মুসলিম বিদ্বেষে পূর্ণ তাঁর গ্রন্থ "আনন্দ মঠে" এ সঙ্গীতটি রয়েছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযানকারী একদল সন্তানের মুখ দিয়ে এই সঙ্গীতটি গাওয়ানো হয়েছিল। এছাড়া এটি দুর্গাদেবীর প্রশস্তি হিসাবে রচিত হয়েছিল। লা-শারীক-আল্লার বিশ্বাসী কোন মুসলমান একে কিছুতেই জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে মেনে নিতে পারেনা। দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলমান এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলল।

কংগ্রেসীরা তবুও একে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবেই রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রইলেন। কিন্তু মুসলমানদের প্রতিবাদ তীব্রতর হয়ে উঠলে কবি রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর তা মীমাংসায় এগিয়ে আসেন। তিনি বল্লেন, প্রথম চার লাইনকে দুর্গার বন্দনা হিসেবে গ্রহণ না করে দেশ মাতৃকার বন্দনা হিসাবে গ্রহণ করা চলে এবং ঐটুকু জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেতে পারে। রবিন্দ্রনাথের এ পরামর্শ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ মেনে নিলেও মুসলমানরা মানতে রাজী হলেন না। তারা জানালেন, বন্দনা ও পূজা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া মুসলমানরা আর কারুর করতে পারে না। তাছাড়া এর রচনার পটভূমি ও এর সঙ্গে মুসলিম বিদ্বেষের যে যোগ রয়েছে, মুসলমানরা তা ভুলে যেতে পারেনা। এটা হিন্দুদের জাতীয় সঙ্গীত হতে পারলেও মুসলমানদের কিছুতেই হতে পারে না। –অতীত দিনের স্মৃতি।

"বন্দে মাতরম" ও "শ্রীপদ্ম"কে কেন্দ্র করে মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীপদ্ম অঙ্কিত মনোগ্রামকে পাঠ্যপুস্তক ও কাগজ পত্রে প্রতীক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার শুরু করে। মওলানা আক্রাম খাঁর পত্রিকা মোহাম্মদীতে শ্রীপদ্ম মনোগ্রাম ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সূচক প্রবন্ধাবলী একের পর এক প্রকাশিত হয়। মুসলমান ছাত্রেরা যুক্তি দিত, 'শ্রী' হিন্দুদের বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'স্বরস্বতী' এবং 'পদ্ম'কে তার আসন হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই পৌত্তলিক ভাবধারার মনোগ্রাম মুসলমানের প্রতীক হতে পারে না। মওলানা আক্রাম খাঁ 'বন্দে মাতরম' ও শ্রীপদ্মের সপক্ষে আনীত যুক্তিসমূহ সাপ্তাহিক ও মাসিক মোহাম্মদীতে তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করতেন। এ আন্দোলনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে 'শ্রী' বাদ হয়ে শুধু 'পদ্ম' থাকে। পদ্মকে বাংলাদেশের একটি ফুল হিসাবে ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এতে মুসলমান ছাত্ররা অনেকটা দমে যায়। 'শ্রী পদ্ম' ও 'বন্দে মাতরমে'র আন্দোলনের ফলে মুসলমানরা দীর্ঘ দিন থেকে এ দেশে মুসলিম নামের পূর্বে ব্যবহৃত 'শ্রী' অক্ষর পরিত্যক্ত হয়। তার বদলে মুসলমানদের নামের পূর্বে 'জনাব' ও 'মৌলভী' ব্যবহারও সম্ভবতঃ তখন থেকেই বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও অনেক মুসলিম বিরোধী কার্যকলাপ তথা সাংস্কৃতিক দিক থেকে মুসলিম চেতনাকে বিনষ্ট করার সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মওলানা আক্রাম খাঁ রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। অবিভক্ত পাকিস্তানকে একটি জনকল্যানমূলক খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র রূপে প্রতিষ্ঠাই তাঁর স্বপ্ন ছিল। এই জন্য পূর্ব থেকেই তিনি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ইসলামী ও আজাদী আন্দোলনকে তাঁর লক্ষ্য বিন্দুতে পৌঁছাতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন।

বলাবাহুল্য, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রতি অনাসক্ত এদেশের আলেম সমাজ ও সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যেও সাংবাদিকতার প্রেরণা মওলানা আকরাম খাঁ, মওলানা মুনিরুজ্জমান ইসলামীবাদী, মুন্সী মেহেরুল্লাহ, ফুরফুরার পীর সাহেব, মওলানা রুহুল আমীন প্রমুখ আলেমরাই অধিক সৃষ্টি করেন। যা হোক, এভাবে যখন আজাদীর ত্রিমুখী চৌমুখী আন্দোলন চলতে থাকলো, তখন ইংরেজ সরকার ভারতবাসীকে আজাদী দানের অভিপ্রায় প্রকাশ করতে বাধ্য হয়।

মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালে শেরেবাংলা মওলভী এ, কে, ফজলুল হকের প্রস্তাবনায় মুসলমানদের জন্যে আলাদা রাষ্ট্রের দাবী জানিয়ে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ

করেন। ইংরেজদের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে, তাদের মনের মতো ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষ ভোগবাদী ব্যক্তিদের হাতেই ভারতের শাসনভার অর্পণ করে তারা বিদায় নিবেন। আর এ জন্যে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বকে তারা মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও দ্বিজাতিতত্ত্বের বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণের কাছে ইংরেজ সরকারের এই আশা পূরণ হয়নি। তিনি সমগ্র ভারতের তওহীদী জনতাকে ইসলামের নামে ডাক দেন এবং মুসলমানদেরকে স্বতন্ত্র ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে মুসলিম লীগের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার উদাত্ত আহবান জানান। উল্লেখ্য যে, প্রভাবশালী কংগ্রেসী নেতাদের সামনে ইসলাম ও আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বিজাতিতত্ত্বের বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণ সমূহ তখন জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী মুসলিম লীগকে পরিবেশন করেন। পরে যথাস্থানে তা বর্ণিত হবে।

দেওবন্দ আন্দোলনের কর্মীবৃন্দ দু'ই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লেন

দেওবন্দ আন্দোলনের কর্মীবৃন্দের নেতৃত্বে এ যাবত সর্বভারতীয় একক ওলামা সংগঠন জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর পরিকল্পিত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসাবে আজাদীর জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলন বিশেষ এক স্তরে পৌছার পর পরবর্তী পর্যায়ে উপমহাদেশের আলেমদের মধ্যে বিনা শর্তে কংগ্রেসে যোগদান ও ভারত বিভাগ প্রশ্নে দ্বিমতের সৃষ্টি হয়। জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ শেষ পর্যন্ত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতিতে অখণ্ড ভারতের সমর্থক কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করে যেতে থাকে।

জামিয়তে ওলামায়ে হিন্দের যুক্তি ছিলো, যেই মুসলমান জাতি সারা ভারত শাসন করেছে, তারা আজ কেন ভারতের দুই অংশে দু'টি ভূখণ্ড নিয়ে সন্তুষ্ট হবে? কিন্তু হিন্দু মানসিকতায় অভিজ্ঞ দূরদর্শী কায়েদে আযম শাহ ওয়ালিউল্লাহর চিন্তায় উদ্বুদ্ধ বিশ্বকবি মরহুম আল্লামা ইকবালের স্বপ্ন অনুযায়ী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের সমন্বয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও তার রূপরেখা উপমহাদেশের মুসলমানদের নিকট পেশ করেন। তাতে এই অঞ্চলের মুসলমান এবার চিন্তিত হয়ে পড়ল। কারণ এক দিকে খন্ড ভারতের স্বপক্ষেও আলেম সংগঠন ও অনেক নামকরা মুসলমান যেমন মওলানা আজাদ প্রমুখ রয়েছেন, অপরদিকে তাদের সামনে অখন্ড ভারত তথা পাকিস্তানের ইসলামী দাবীর আকর্ষণ।

জনগণ আলেমদের মতামতের প্রতীক্ষায় ছিল

জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সঙ্গে জড়িত আজাদী আন্দোলনের কতিপয় প্রখ্যাত জনপ্রিয় সংগ্রামী আলেম মুসলিম লীগকে সমর্থন না করায় বহু মুসলমান দ্বিধাদ্বন্দ্বে পতিত হয়ে পড়ে। আর এ সুযোগে ইংরেজ সরকারও কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার জন্যে চিন্তা-ভাবনা করছে। আলেমদের প্রতি জনগণের প্রতীক্ষার কারণ ছিল এই যে, মুসলিম স্বার্থে খন্ড ভারতের প্রবক্তা কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বললেও লীগ বিরোধীদের প্রচারণায় সাধারণ মানুষ বিভক্ত

ছিল। যেমন মুসলিম লীগের দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়, লীগের নেতা "পাশ্চাত্য ধাঁচের জেন্টেলম্যান" আবার তিনি "শিয়া" –এসব বলেও এ দেশের হানাফী মতাবলম্বী ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছিল। সে সময় এদেশের সাধারণ মুসলিম জনসাধারণ যাদের নেতৃত্বে অধিক উঠাবসা করে, সেই আলেম সমাজের মতামতের অপেক্ষায় থাকে।

ওলামায়ে কেরাম এগিয়ে এলেন –

কংগ্রেস যেমন ভারতীয় জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ায় তা যুক্ত-জাতীয়তা ও অখণ্ড ভারতের যুক্তির পক্ষে মুসলমানদের সমর্থন লাভে সচেষ্ট ছিল, তেমনি মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান দাবীর সপক্ষে আলেমদের সমর্থন কামনা করেও তখন পাকিস্তান সমর্থক আলেমগণ খন্ড ভারতের যৌক্তিকতা প্রমাণ ও ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবীকে জোরদার করে তোলার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন এবং পাকিস্তান সমর্থক আরেকটি ওলামা সংগঠন কায়েমের তীব্র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

কলকাতায় জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম গঠন (১৯৪৫ ইং)

কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মওলানা শাব্বির আহ্‌মদ উসমানী, মওলানা আকরাম খাঁ, মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী, মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন মুসলমানদের ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সংকীর্ণ মনোভাবের প্রেক্ষিতে ভারত বিভক্তির দ্বারা মুসলমানদের জন্যে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী তুললেন, অপরদিকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর মওলানা মওদূদীও এর সমর্থনে তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি ও বলিষ্ঠ লেখনী চালনা করলেন, তখন পাকিস্তানের সমর্থনে উপমহাদেশের সিংহভাগ ওলামায়ে কেরাম ও পীর-মাশায়েখ এগিয়ে আসেন। বিশেষ করে শুরু থেকে হাকীমুল উম্মত মওলানা আশরাফ আলী থানবী জিন্নাহ্ সাহেবের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে আসেন। অন্যান্য খ্যাতনামা ইসলামী ব্যক্তিত্বের মধ্যে মওলানা জাফর আহমদ উসমানী, মওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, মওলানা ইহ্‌তেশামুল হক থানভী, মওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, মওলানা জাফর আহ্‌মদ আনছারী, শর্ষিণার বড়পীর মওলানা নেসারুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব, ফুরফুরার পীর মওলানা আবদুল হাই ছিদ্দীকী সাহেব, মওলানা আতহার আলী সাহেব, মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, পীর বাদশা মিঞা, মওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ, মওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানী, মওলানা আবদুল আলী ফরিদপুরী, মওলানা সাইয়েদ মোসলেহুদ্দীন, মওলানা বজলুর রহমান দয়াপুরী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম এগিয়ে আসেন।

এভাবে মুসলিম লীগের সঙ্গে পাকিস্তানের জন্যে যারা কাজ করে আসেন বা যারা এতদিন এর বাইরে ছিলেন, সে সকল ওলামায়ে কেরামের উদ্যোগে ১৯৪৫ সালে কলকাতা মোহাম্মদ আলী পার্কে পাকিস্তান সমর্থক সর্বভারতীয় আলেমদের এক ঐতিহাসিক ওলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে যুক্ত ভারতের সমর্থকও বহু

আলেম উপস্থিত ছিলেন। এ সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে দেওবন্দ দারুল উলুমের সাবেক অধ্যক্ষ প্রখ্যাত আলেম মওলানা শাব্বীর আহ্‌মদ উসমানীকে এই জমিয়্যতের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। সে দিনই সর্বভারতীয় ওলামা প্রতিষ্ঠান জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। এক দল দারুল উলুম দেওবন্দের অধ্যক্ষ শায়খুল হাদীস হযরত মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর নেতৃত্বে 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' নামে ভারতে আর অপর দল মওলানা শাব্বীর আহ্‌মদ উসমানীর নেতৃত্বে 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের' নামে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে আজাদী আন্দোলন চালিয়ে যান।

মওলানা শাব্বীর আহ্‌মদ উসমানী

পাক-ভারত উমহাদেশে ইসলামী রেনেসাঁর উদগাতা মহামনিষী শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভীর চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে একদিন যে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, সেই আন্দোলনেরই একটি অংশ হিসাবে পরে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয় যা পূর্বে বলা হয়েছে। সে থেকে দারুল উলুম দেওবন্দ আজ পর্যন্ত এই উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রসার দান ও উৎকর্ষ সাধনে কাজ করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিষ্ঠাতা সকলেই ছিলেন সেই ওয়ালীউল্লাহ আন্দোলনের সংগ্রামী কর্মী। তাঁদের সকলেই ছিলেন ১৮৫৭ সালে মহাবিপ্লবের সঙ্গে জড়িত। তাই দেখা যায়, এ প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষালাভকারী একেকজন ছাত্র ছিলেন সংগ্রামী এবং আজাদী আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ত্যাগী বীর পুরুষ। এই আন্দোলনের ঘাঁটি থেকে যে সমস্ত বীর মোজাহিদ বের হয়েছেন এবং পরে দারুল উলুমকে কেন্দ্র করে সারা অবিভক্ত ভারতে আজাদী ও ইসলামী আন্দোলনকে নানাভাবে জোরদার করে তুলেছিলেন, তাদের মধ্যে মওলানা শাব্বীর আহ্‌মদ ওসমানী একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। মওলানা শাব্বীর আহ্‌মদ ওসমানী বিশ্ববিখ্যাত এই ইসলামী শিক্ষা ও আন্দোলনের কেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দের অধ্যক্ষ ছিলেন। ভারত বিভাগ প্রশ্নে যখন সর্বভারতীয় ওলামা প্রতিষ্ঠান জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ দুই অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তখন তিনি এক অংশের নেতৃত্ব দেন। জমিয়তের এই অংশটির নাম ছিলো জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম। এভাবে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ আন্দোলনের কর্মীগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে এক অংশ পাকিস্তানে কাজ করতে থাকে আর অপর অংশ হিন্দুস্তানে থেকে যায়।

মওলানা শাব্বীর আহ্‌মদ ওসমানীর বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, উপমহাদেশে তাঁর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ যেখানে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের প্রশ্নে একমত হতে পারেননি, সেক্ষেত্রে তিনি হিন্দু মানসিকতার অভিজ্ঞতার আলোকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে দেশ বিভাগের জন্যে উঠেপড়ে লাগেন। পাকিস্তানের জন্যে তাঁর আন্দোলন ও সংগ্রামকে একশ্রেনীর ওলামাবিদ্বেষী কুচক্রী লেখক যতই ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করুক না কেন, তা এ দেশের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় মরহুম

মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানীর যে বিরাট অবদান রয়েছে, তা কারো অস্বীকার করার উপায় নেই। মূলত: তিনি মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির আন্দোলনে কায়েদে আযমের পাশাপাশি থেকে কাজ করেছেন। নিকট অতীতের একথা কারো অবিদিত থাকার কথা নয় যে, কায়েদে আযম ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে অবিভক্ত পাকিস্তান দাবীকে যতই জোরদার করতে চেয়েছেন এবং বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যতই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার-প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন কিন্তু আলেমদের সক্রিয় অংশগ্রহনের আগে তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। কায়েদে আজমকে "শিয়া", "তাঁর দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া সম্ভব নয়" –এসব বলে যখন জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ বিরূপ মন্তব্য করছিলেন, তখন মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের "প্লাটফরম" থেকে পাকিস্তানের শ্লোগান বুলন্দ করার আগ পর্যন্ত এ দেশের মুসলমানরা ব্যাপকভাবে পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েনি। উক্ত প্রচারণার প্রেক্ষিতে উপমহাদেশের ধর্মপ্রাণ হানাফী মতাবলম্বী মুসলমানদের এরূপ ইতস্তত করাটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। দীর্ঘ দিনের সাহচর্যে হিন্দু নেতাদের মানসিকতা সম্পর্কে পরিচিত স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার অধিকারী দূরদর্শী মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী অনুধাবন করতে পারছিলেন যে, ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে ভারতে আলাদা একটি ভূখণ্ড লাভ ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। তিনি এই অনুভূতিতেই এক জাতিত্বের প্রশ্নে কংগ্রেস সমর্থক জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ থেকে বের হয়ে আসেন এবং দ্বি-জাতিত্বের ভিত্তিতে আলাদা রাষ্ট্রের দাবীকে জোরদার করার জন্যে সক্রিয় নেতৃত্ব দান করেন। কলকাতার মুহাম্মদ আলী পার্কে ১৯৪৫ সালে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম গঠিত হয়। পাকিস্তান আন্দোলনে জনমত গঠনের জন্যে তিনি লেখনী ধারণ করেন এবং দেশজোড়া ঝটিকা সফর করে বক্তৃতা-বিবৃতি দেয়া শুরু করেন। জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম অবিভক্ত পাকিস্তান আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য মুসলিম লীগের সমর্থনে কাজ করে যেতে থাকে। বস্তুতঃ জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের উদাত্ত আহবানের পর থেকেই উপমহাদেশের মুসলমানরা দ্বিধাহীন চিত্তে কায়েদে আযমের নেতৃত্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগ দিয়ে "লড়কে লেংগে পাকিস্তান" ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস-জনপদ মুখরিত করে তোলে।

১৩০৫ হিজরী ১০ই মহররম তারিখে বিজনুরের সম্ভ্রান্ত ওসমানী পরিবারে মওলানা শাব্বীর আহমদ. ওসমানীর জন্ম। তাঁর পিতা মওলানা ফজলুর রহমান ওসমানী মাদ্রাজের ডেপুটি ইন্সপেক্টর ছিলেন। বংশ পরিচয়ের দিক থেকে তিনি তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমানের (রাঃ) বংশধর। ১৩১২ হিঃ সালে মুহাম্মদ আযীম নামক জনৈক শিক্ষকের নিকট শাব্বীর আহমদ ওসমানী দ্বীনি শিক্ষার প্রাথমিক সবক গ্রহণ করেন। তাঁর অংক ও উর্দু ভাষার প্রথম পাঠ মুনশী মনযুর আহমদ দেওবন্দীর নিকট শুরু হয়। তিনি মুফতী শফী সাহেবের পিতা মুহাম্মদ ইয়াসীন সাহেবের নিকট ফারসী ভাষা শিক্ষালাভ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৩১৯ হিঃ সালে মুসলিম জাহানের

অন্যতম প্রধান দ্বীনি শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দে অধ্যয়ন করতে থাকেন। মওলানা ওসমানী ১৩২৫ হিঃ মোতাবেক ১৯০৮ খ্রীঃ 'দাওরা-এ হাদীস' পরীক্ষায় দেওবন্দে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সেখানেই তাঁর শিক্ষা জীবনের ইতি ঘটে। তাঁর খ্যাতনামা শিক্ষকদের মধ্যে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নির্যাতিত সংগ্রামী নেতা শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মওলানা মাহমুদুল হাসান ইংরেজ সরকার কর্তৃক দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবত মাল্টা দ্বীপে অন্তরীণাবদ্ধ ছিলেন। ১৩২৫ হিজরীতে মওলানা ওসমানীর পিতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁর পিতা দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা ত্যাগী পুরুষ মওলানা কাসেম নানতুবীর বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ১৩২৮ হিজরীতে মওলানা ওসমানী প্রথম পবিত্র হজব্রত পালন উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন। জনাব ওসমানী ছাত্র-জীবনেই নানানভাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর ১৩২৬ হিজরীতে দিল্লীর ফতেহপুরস্থ এক আরবী মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৩২৮ হিজরী সাল মোতাবেক ১৯১১ খৃঃ দারুল উলুম দেওবন্দের ব্যবস্থাপনা কমিটি তাঁকে এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক হিসেবে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি ১৯১১ খৃঃ থেকে ১৯২৮ খৃঃ পর্যন্ত সিনিয়ার অধ্যাপক হিসাবে তথায় কাজ করেন। শিক্ষকতার বিনিময়ে মওলানা ওসমানী কোন অর্থ গ্রহণ করতেন না। ঠিক ঐ সময় শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসানের নির্দেশক্রমে মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী কর্তৃক 'জমিয়তুল আনসার' ও এর বিপ্লবী সংস্থা 'আজাদ হিন্দ মিশন' গঠিত হয়। মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি ও ইসলামী ভাবধারার জাগৃতির মাধ্যমে ভারতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ছিল এ সংস্থার আসল লক্ষ্য। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মওলানা ওসমানী বলকানে রাজনৈতিক সফরে গিয়েছিলেন। তিনি শায়খুল হিন্দের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং উক্ত সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিরাট বিরাট অধিবেশনে মূল্যবান প্রবন্ধাদি পাঠ করতেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ শুনে মওলানা শিবলী নোমানীর মতো চিন্তাবিদগণ ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) 'ইসলাম' শীর্ষক ওসমানীর একখানা প্রবন্ধ শুনে প্রকাশ্য সভায় তাঁর প্রশংসা করেন।

খেলাফত আন্দোলন

স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের রাজানীতিতে মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সকল সময় জড়িত ছিলেন। ১৯১৪ খৃঃ থেকে ১৯১৮ খৃঃ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ের পর খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়। খেলাফত আন্দোলনে মওলানা ওসমানীর বিরাট ভূমিকা ছিল। মওলানা ওসমানীর শিক্ষাগুরু শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান বিদেশী পণ্য বর্জন আন্দোলনে গ্রেফতার হয়ে মাল্টা দ্বীপে পাঁচ বৎসর অন্তরীণাবদ্ধ থাকার পর মুক্তি পেলে তিনি পরবর্তী সভাসমিতিতে তাঁর সঙ্গে থাকতেন। সাহারানপুর, গাজীপুর, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেনারস, আলীগড় প্রভৃতি স্থানে তিনি শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসানের সঙ্গে আজাদী আন্দোলনে শরীক ছিলেন।

জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ

খেলাফত আন্দোলনকালেই ১৯১৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের কর্ম-পরিষদের সদস্য ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে বিরাট কাজ করেছেন। ১৯২০ সালের ১৯, ২০ ও ২১শে ডিসেম্বর দিল্লীতে শায়খুল হিন্দের এক বিরাট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কনফারেন্সে তিনি 'অসহযোগ' শিরোনামে লিখিত এক ভাষণ পাঠ করেন। তাঁর উক্ত মূল্যবান ভাষণ উপমহাদেশীয় শ্রেষ্ঠ আলেমদের মধ্যে তাঁকে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। ঐ ভাষণের মধ্য দিয়েই তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ইসলাম সম্পর্কিত গভীর পাণ্ডিত্যের অভিব্যক্তি ঘটেছিল।

হিন্দু মুসলিম ঐক্য

খেলাফত আন্দোলনের ফলে হিন্দুদের মধ্যেও সাহসের সঞ্চার হলো। তারাও হাত-পা মেলতে শুরু করলো। জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সভা-সমিতির পাশাপাশি একই শহরে কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হতে থাকে। তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছিলো পুরোদমে। এই সঙ্গে হিন্দু মুসলমান ঐক্যেরও প্রচেষ্টা চলতে থাকে। হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও মুসলমানরা পরস্পরের সভায় বক্তৃতা দিতেন। কংগ্রেসীদের মুখে তখন "হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই" –এর শ্লোগান। মওলানা ওসমানী হিন্দু মুসলিম যুক্ত অধিবেশনে মুসলমানদের ন্যায্য অধিকারের প্রশ্নে জোরালো বক্তৃতা দিতেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের যাতে হিন্দুদের পশ্চাতে পড়ে না থাকতে হয়, সে ব্যাপারে এবং গরু জবেহ বন্ধ কিংবা মুসলমান মেয়েদের কপালে তিলক-ফোঁটা ব্যবহার করা প্রভৃতি হিন্দুয়ানী রীতির প্রতি শৈথিল্যের আবদারকে তিনি কিছুতেই বরদাশ্ত করতেন না।

শর্তহীনভাবে কংগ্রেসে শরীক হবার বিরোধিতা

দিল্লীতে যে হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে মিঃ গান্ধী, মতিলাল নেহেরু, মওলানা আবুল কালাম আযাদ ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অধিবেশনে এ বিষয়টি আলোচনাধীন ছিল যে, মুসলমানদের কি বিনাশর্তে কংগ্রেসে শরীক হওয়া উচিত, না তাদের অধিকার মেনে নেয়ার শর্তে হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতা করা? মুসলমানদের একটি দল বিনাশর্তে কংগ্রেসে যোগদানের সপক্ষে মত প্রকাশ করে। কিন্তু দূরদর্শী মওলানা উসমানী কংগ্রেসের সুচতুর হিন্দু নেতাদের দলে এভাবে বিনাশর্তে যোগদানকে কিছুতেই মানতে রাজী

হননি। সভাপতির অনুমতিক্রমে তিনি মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের শর্ত ব্যতিরেকে কংগ্রেসে যোগদানের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দান করেন। তাতে মিঃ গান্ধী নেহেরু বিব্রত বোধ করতে থাকলেও তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে দিয়েছিলেন যে, "আমার এই সহজ ও সরল ভাষণের মধ্য দিয়ে সেসব বাস্তব সত্যকেই আমি তুলে ধরতে চাই, যাতে মুসলিম স্বার্থকে বানচাল করার সকল প্রকার ষড়যন্ত্রজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য।" বস্তুতঃ তাঁর উক্ত ভাষণই পরবর্তীকালে "জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের" ভিত্তি স্থাপন করে এবং কংগ্রেস সমর্থক জমিয়্যতে ওলামায়ে হিন্দ থেকে সম্পর্কচ্যুতির কারণ হয়।

দিল্লীর উক্ত সম্মিলিত অধিবেশনের পর উক্ত শহরেই আলাদাভাবে মুসলমানদের আর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে মওলানা উসমানী যুক্তিপূর্ণ ভাষণের দ্বারা মুসলমানদেরকে হিন্দুদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন করে দেন। তাঁর বক্তৃতায় মুসলমানদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। কেননা, ইতিপূর্বে হিন্দু-মুসলমান সহযোগিতার প্রশ্নে সাধারণ মুসলমান ও আলেম সমাজ যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন, এখন থেকে তাঁরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হবার পথ খুঁজে পান। বস্তুতঃ দিল্লী অধিবেশনের পর থেকেই তিনি কংগ্রেস সমর্থক জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ বর্জন করে খণ্ড ভারতের সমর্থক আলেমদের আলাদা একটি সংস্থা গঠনের বিষয় চিন্তা করেন। অবশ্য তখন পর্যন্ত এর কোনো পরিকল্পনা তিনি প্রকাশ করেননি। তাঁর তখনকার বক্তৃতার সুরই ছিল এই যে, "মুসলমানরা একটি ঐতিহ্যপূর্ণ আলাদা জাতি হিসাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে কোনোদিনই নিজ আদর্শ নিয়ে স্বাধীনভাবে চলতে পারবেনা।" ভারত-বিভাগ তথা পাকিস্তানের সপক্ষে তাঁর বলিষ্ঠ যুক্তি এই ছিল যে, –"পিঞ্জিরাবদ্ধ পাখী সবসময় মুক্তি পেতে চাইলেও পিঞ্জিরার সামনে কোনো বন্য বিড়াল দাঁড়ানো থাকলে সে কখনও তার থেকে মুক্তি পেতে চায় না।"

জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও মওলানা উসমানী

অক্টোবর ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় মুহাম্মদ আলী পার্কে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ওলামা সম্মেলনে দেশ বিভাগের সমর্থক ও বিরোধী উভয় শ্রেণীর ওলামা প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত থাকলেও মূলত পাকিস্তান সমর্থক আলেমদের উদ্যোগেই উক্ত ঐতিহাসিক সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে উপমহাদেশের খ্যাতনামা আলেমদের মধ্যে ছিলেন মওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, মওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম শিয়ালকোটী, আবুল বারাকাত মওলানা আবদুল রউফ দানাপুরী, মওলানা আযাদ সোবহানী, মওলানা তাহের কাসেমী ও মওলানা গোলাম মোরশেদ খতীব আলীগড় মসজিদ। বাংলাদেশের মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মওলানা সাইয়েদ মোছলেহ উদ্দীন, মওলানা আতাহার আলী প্রমুখ। উক্ত সম্মেলনে মওলানা উসমানী অসুস্থতাবশতঃ উপস্থিত হতে

না পারলেও তাঁর লিখিত ভাষণ সম্মেলনে পঠিত হলে পাকিস্তান দাবী ও মুসলিম লীগকে সমর্থনের প্রশ্নে শ্রোতাদের মধ্যে তা যাদুমন্ত্রের ন্যায় চেতনার উদ্রেক করে। সে-দিনই আনুষ্ঠানিকভাবে "জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মওলানা উসমানীকে এই জমিয়তের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। মওলানা উসমানী মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির সপক্ষে যে-সব জোরালো যুক্তি পেশ করতেন এবং কংগ্রেস ও অখণ্ড ভারতের সমর্থক বিচহ্বখকটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রের আবশ্যক, যেখান থেকে তারা পাবে প্রেরণা এবং বিকাশ ঘটবে তাদের জাতীয় ভাবধারার। ঐ কেন্দ্রে তারা পূর্ণ স্বাধীন ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবার সাথে সাথে খোদায়ী জীবন বিধানকেও নির্বিবাদে চালু করার অধিকারী হবে। শুধু তাই নয়, ক্ষ্য বির্তমান বিশ্বে আজ যে জিনিসের বিশেষ অভাব অনুভূত, প্রস্তাবিত কেন্দ্রে সেই দুর্লভ ন্যায়বিচার ও পক্ষপাতমুক্ত খোদায়ী জীবন ব্যবস্থার বাস্তবায়নের মাধ্যমে তারা বিশ্ববাসীকে দেবে পথের সন্ধান।"

"বর্তমান বিশ্ব-রাজনীতির প্রচলিত ধারা অনুযায়ী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত স্বাধীন দেশে আমরা এই মহান লক্ষ্য কার্যকরী করতে পারবো। আমাদের আকাংখিত ভূখন্ডটির নাম 'পাকিস্তান' কিংবা 'হুকুমতে এলাহিয়া' অথবা অন্য যে কিছুই হোক তবে এটা নিশ্চিত যে, একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে মুসলমানদের অবশ্যই একটি কেন্দ্রের প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু জাতিদ্বয়ের যুক্ত-শাসনাধীনে এ লকছুতেই অর্জিত হতে পারে না।"

মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন

তিনি অন্যত্র বলেন যে, "আমি দীর্ঘ দিন থেকে দেশ বিভাগ প্রশ্নটি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেছি। এর ভালমন্দ প্রত্যেকটি দিক বিবেচনার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এ মুহূর্তে পাকিস্তান লাভের জন্যে শরীয়তের আওতাধীন থেকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে মুসলিম লীগকে সমর্থন করা উচিত। কারণ, খোদানাখাস্তা মুসলিম লীগ নির্বাচনে হেরে গেলে পুনরায় দীর্ঘদিনের জন্য উপমহাদেশের মুসলমানদের আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই এই পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগের হাতকে মজবুত করা সকল মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। এ সঙ্গে সকল মুসলমানকে বিভিন্ন উপায়ে একথা প্রকাশ করা উচিৎ যে, আমরা নিজেদের ধর্ম ও প্রকৃত জাতীয়তার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই মুসলিম লীগের নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তবে সকল ধর্মীয় ব্যাপারে ধার্মিক খোদাভীরু আলেমদের কথাকেই আমরা সকলের কথার উপর প্রাধান্য দেবো।"

জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের ঘাটি দেওবন্দে উসমানীর জনসভা

পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি যে দুর্জয় মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন এবং কলকাতা মুহাম্মদ আলী পার্কের ওলামা সম্মেলনের দু'মাস পর ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে খোদ কংগ্রেস রাজনৈতিক দর্শনের সমর্থক আলেমদের কেন্দ্রভূমি দেওবন্দের এক বিরাট জনসমাবেশে তিনি যে নির্ভীক উক্তি করেছেন, তা এ দেশের ইতিহাসে চিরদিন লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। ঐদিন তিনি বলেছিলেন ঃ

"শারীরিক অসুস্থতার দরুণ আমি জাতির সমস্যাবলী থেকে এক রকম দীর্ঘকাল প্রবাসী জীবন যাপন করেছি। কিন্তু মুসলমানগণ বর্তমানে যে নানান সংকট সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে, তার শেষ পরিণতি এতই গুরুতর যে, তা আমাকে এই রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও রাজনীতির ময়দানে টেনে নিয়ে এসেছে। খেলাফত আন্দোলনের পর থেকে আমি সক্রিয় রাজনীতি থেকে প্রায় দূরেই সরে গিয়েছিলাম, কিন্তু দীর্ঘ দিনের চিন্তা-ভাবনার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, পাকিস্তান অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলে রক্ত দেয়াকে আমি গৌরবের বিষয় বলে মনে করবো।"

জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের দুর্বার আন্দোলন

মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) দেওবন্দ আন্দোলনের মূল লক্ষ্যকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ রাজনীতির পরিবর্তে লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে জাগ্রত ও স্থায়ী করার কাজে লিপ্ত ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর চেষ্টা-সাধনা ও লেখনীর বদৌলতে তিনি ইসলামের যে মহান খেদমত করেছেন, তা পাক-ভারতের মুসলিম ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি পাকিস্তান প্রস্তাবকে সমর্থন জানালে তাঁর পরিশ্রমের ফলশ্রুতি হিসাবে সারা অবিভক্ত ভারতে যে-সব স্থানে ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র ও তাঁর অনুসারীরা ছিলেন, সবাই মুসলিম নেতৃবৃন্দের আহবানে পাকিস্তান আন্দোলনে এগিয়ে আসেন। মওলানা থানভী (রঃ) কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে পত্র-বিনিময় করেন ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শাব্বীর আলীর দ্বারা জিন্নাহ্ সাহেবকে ইসলামী শরীয়তের ব্যাপারে বহু জ্ঞান দান করেন। স্বয়ং কায়েদে আযমও একথা স্বীকার করেছেন। বলা বাহুল্য, কায়েদে আযম চরিত্রে পোষাক-আশাকের দিক থেকে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে, সেটা মূলতঃ মওলানা থানভীরই উপদেশের ফল ছিল।

বাংলার আলেম সমাজ

ঐ সময় বাংলা দেশে মওলানা থানভীর বিশেষ শিষ্য মওলানা শামসুল হক্ক ফরিদপুরী ও প্রখ্যাত সংগ্রামী আলেম মওলানা আতহার আলী সাহেব মুসলমানদের আলাদা বাসভূমি পাকিস্তানের জন্য বিরাট কাজ করেন। মওলানা জা'ফর আহমদ ওসমানী, মওলানা সোলায়মান নদভীকে নিয়ে মওলানা আতহার আলী সাহেব সিলেট গণভোটের প্রাক্কালে পাকিস্তানের সপক্ষে সভা-সমিতির মাধ্যমে বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলেন। সেদিন তাঁরা এগিয়ে না এলে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ প্রভাবিত সিলেট পাকিস্তানভুক্ত হতো কি না সন্দেহ। পাক-বাংলার প্রখ্যাত যুক্তবাদী আলেম চট্টগামের মওলানা সিদ্দীক আহমদ সাহেবও সে সময় আজাদী আন্দোলনে বক্তৃতা, সভা-সমিতির মাধ্যমে অনেক কাজ করেন। মওলানা থানভীর শিষ্য বাংলার সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুযর্গ হাফেজজী হুযুর (মওলানা মোহাম্মদুল্লাহ সাহেব) ও পীরজী হুযুর (মওলানা আবদুল ওহাব সাহেব) -ও তাঁদের ভক্ত অনুসারীদের নিয়ে পাকিস্তানের জন্যে কাজ করে যান।

এভাবে বাংলার প্রখ্যাত পীর শর্ষিণার হযরত মওলানা নেসারুদ্দীন আহমদ সাহেব, পীর বাদশা মিয়া সাহেব এবং হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র বংশধর পীর মুহসিনুদ্দীন এবং ফুরফুরার পীর আবদুল হাই ছিদ্দীকী সাহেবান পাকিস্তানের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। তাঁরা নিজেদের লক্ষ লক্ষ ভক্ত-মুরিদ ও অনুগামীর দ্বারা বাংলার ঘরে ঘরে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের প্লাটফরম থেকে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁদের আন্দোলনের ফলেই সেদিন বাংলার আনাচে-কানাচে, মসজিদে-মাদ্রাসায়, স্কুলে-কলেজে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান", "মারকে লেঙ্গে পাকিস্তান, "পাকিস্তানের লক্ষ্য কি- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

ফুরফুরার পীর সাহেব [১৮৪১--১৯৩৯ খৃঃ]

যে-কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে ত্যাগ ও সংগ্রাম কোনো দিন বৃথা যেতে পারে না। গৌণে হলেও তার ফলশ্রুতি দেখা দেবেই। আর তাই দেখা যায়, ওয়ালিউল্লাহ আন্দোলনের কর্মীদের রক্তে বালাকাটের খুনরাঙা জমিনে যে ইসলামী আন্দোলনের বীজবৃক্ষ জন্ম নিয়েছিল, তার শাখা-প্রশাখা একদিকে যেমন ভারতের অন্যান্য অংশে

বিস্তার লাভ করে, তেমনিভাবে বাংলাদেশের মাটিতেও সে বৃক্ষ শিকড় বিস্তার করে। এ জন্যেই দেখা যায়, যখন দিল্লীতে ১৮০৩ খৃঃ মওলানা শাহ আবদুল আজীজ দেহলভীর ইংরেজ বিরোধী ফতওয়া প্রচারিত হয়েছে, বাংলাদেশেও হাজী শরীয়তুল্লাহ্ (১৭৮১-১৮৪০ খৃঃ) ইসলামী আন্দোলনের ঝাণ্ডা বুলন্দ করে তুলেছেন। আবার যখন ওয়ালিউল্লাহ্ আন্দোলনের এ সংগ্রামী কাফেলা বালাকোটের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন মওলানা সাইয়েদ হাজী নিসার আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১ খৃঃ) উস্তাদ সাইয়েদ আহ্‌মদের অনুকরণে এখানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাঁশের কেল্লার প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন এবং সাইয়েদ আহ্‌মদের শিষ্য মরহুম মওলানা কারামত আলী জৈনপুরীও (১৮০০-১৮৭৩ খৃঃ) বাংলার আকাশে-বাতাসে ইসলামের সৌরভ ছড়িয়ে দিচ্ছেন। হাদিয়ে বাঙ্গাল মওলানা কারামত আলী জোনপুরী মুসলিম যুব সমাজকে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রশিক্ষণ দিয়ে এখানে ইসলামী রাষ্ট্রের অবকাঠামো নির্মাণ করেন।

ঠিক তেমনিভাবে বাংলায় ইসলামী রেনেসাঁ সৃষ্টিকারী ফুরফুরার পীর হযরত মওলানা আবু বকর ছিদ্দিক সাহেবও ঐ বালাকোট কেন্দ্রিক ইসলামী আন্দোলনেরই আর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তার পরবর্তী পর্যায়ে মুনশী মেহেরুল্লাহর (জন্ম ১৮৬২-১৯০৭ খৃঃ) খৃষ্টান মতবাদ বিরোধী আন্দোলন ও তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি বাংলার মাটি থেকে ঈসায়ী ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে চলেছিল। তাঁর আন্দোলনকেও বালাকোট আন্দোলনের বাইরে বলা চলে না।

ফুরফুরার পীর সাহেব মওলানা আবু বকর ছিদ্দীক ১৮৪১ সালে কলকাতার হুগলী জেলার ফুরফুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাইয়েদ আহ্‌মদ শহীদের বিশেষ খলীফা হাফিয জালাল উদ্দীনের নিকট হাদীস, তাফসীর ও ফেকাহ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধনা করেন। পরে এ সিলসিলারই চট্টগ্রামের শাহ্ সুফী মরহুম ফতেহ আলীর নিটকও তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন।

মওলানা আবুবকর ছিদ্দীক যে সময় পরিণত বয়সে এবং যখন তাঁর কর্মময় জীবনের সূচনা, তখন বাংলাদেশ সহ গোটা ভারতের মুসলমানের জীবনে চরম দুর্দিন। উপমহাদেশের রাজনৈতিক আকাশ তখন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার পর মুসলমানদের জীবনে চরম দুর্দিন নেমে এসেছে। মুসলমানদের মাথায় ভেঙ্গে পড়েছে বিপদের পাহাড়। ঠিক তখনই এক রাতে "স্বপ্নে আযান দেওয়ার" একটি ঘটনা তাঁকে কর্মমুখর করে তোলে। এ স্বপ্ন দেখার পর থেকে তিনি বাংলার মানুষের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচারে উঠেপড়ে লাগেন। তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, চারিত্রিক গুণাবলী ও দার্শনিক যুক্তি মানুষকে অভিভূত করে তুললো। বহু অমুসলিম তাঁর হাতে ইসলামের দীক্ষা নেয়। বাংলা, আসাম সহ ভারতের লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাঁর হাতে মুরীদ হয়।

বক্তৃতার প্রভাব সাময়িক, তাই মাতৃভাষায় সাহিত্য সাংবাদিকতার দ্বারা ইসলাম প্রচারের আধুনিক পদ্ধতির প্রতি ফুরফুরার পীর সাহেব অধিক যত্নবান ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় অনেক দ্বীনি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হয়। বিশ শতকের গোড়ার দিকে গ্রাম বাংলার স্বল্প শিক্ষিত মুসলিম জনসাধারণের অতিপ্রিয় "মুসলিম হিতৈষী'র তিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বহু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। যথা– মিহির ও সুধারক, ইসলাম প্রচারক, নবনুর, ইসলাম দর্শন, হানাফী, মোহাম্মদী, শরীয়তে ইছলাম, ছুন্নাতুল জামায়াত, হেদায়েত, ছোলতান ইত্যাদি।

ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে মুসলমানদের বিশেষ করে সর্বভারতীয় ওলামা প্রতিষ্ঠান 'জমিয়তে ওলামা'র বাংলা ভাষায় মুখপত্রের অভাব তীব্রভাবে উপলব্ধি করেন। রোগশয্যায় শায়িত থেকেও তিনি "মোছলেম" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এ পত্রিকার জন্যে পীর সাহেব নিজ তহবিল থেকে ১ হাজার টাকা প্রদান করেছিলেন।

একদিকে পত্র-পত্রিকা, ওয়াজ-নছীহত অপরদিকে নিজের শিষ্য-শাগরিদদের মাধ্যমে বাংলা ও আসামে তিনি ইসলামী আন্দোলন চালিয়ে যান। তদ্রূপ তাঁর অবর্তমানেও যাতে এ মহৎ কাজের চর্চা এখানে অব্যাহত থাকে, সে জন্য তিনি বাংলাদেশে অসংখ্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। জনশ্রুতি আছে, একই মহফিলের প্রাপ্ত চাঁদায় নোয়াখালীর বিখ্যাত ইসলামিয়া মাদ্রাসাটি একই দিনে তিনি স্থাপন করে আসেন। 'মাদ্রাসায়ে ফতেহিয়া ইসলামিয়া ফুরফুরা'র জন্য তিনি বহু সম্পত্তি ওয়াকফ করেন।

ফুরফুরার পীর সাহেবের একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি দ্বীনি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হালাল রুজী অর্জনের নিয়তে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের বিরোধী ছিলেন না, যেমন কোনো কোনো আলেম তখন আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের প্রশ্নে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। মাদ্রাসা শিক্ষায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষা না থাকায় মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা যথার্থ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। দ্বীনি শিক্ষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তির অধিকারী হয়েও আধুনিক মানে তারা দ্বীনের সত্যকার শিক্ষা আদর্শ তুলে ধরতে অক্ষম। অন্যদিকে অর্থকরী শিক্ষার অভাবে কর্মজীবনেও নিজের বিবেকবিরোধী অনেক ভ্রান্ত পথ তাদের অবলম্বন করতে হয়। ফুরফুরার পীর সাহেব ছিলেন এ শ্রেণীর আলেমের ব্যতিক্রম। তিনি এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী ছিলেন যাতে কেউ মাদ্রাসা শিক্ষা লাভের পর মাদ্রাসা বা খানকাহ্ ছাড়া অন্য কোথাও ঠাঁই না পায়। বরং মাদ্রাসা শিক্ষকরা দ্বীনি এলেমের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা লাভ করে হালাল রুজি-উপার্জন করতে সক্ষম হোক, এ জন্যে তিনি ফুরফুরা শরীফে ওল্ড স্কীম

মাদ্রাসার সঙ্গে একটি প্রকাণ্ড নিউ স্কীক মাদ্রাসাও স্থাপন করেন। মূলতঃ তাঁর এই বাস্তবধর্মী ভূমিকার ফলেই দেখা যায়, বহু লোক ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেও তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করেছেন এবং বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দ্বীনি কাজ করে গেছেন। তন্মধ্যে তাঁর খলীফা প্রফেসার মরহুম আবদুল খালেক এবং এশিয়া বিখ্যাত অন্যতম ভাষাবিদ মরহুম ডক্টর শহীদুল্লাহর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মওলানা আবুবকর সাহেব বাংলা-আসামের মুসলমানদের মধ্য থেকে বেদয়াত, শিরক ও যাবতীয় কুসংস্কার দূর করার উদ্দেশ্যে এবং ইংরেজ ও হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতির হাত থেকে এ দেশের মুসলমানদের রক্ষার জন্যে রীতিমতো আন্দোলন চালিয়েছেন।

তাঁর ইসলামী আন্দোলন ছিল সর্বমুখী। শিক্ষা ক্ষেত্রে, সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে, মুসলমানদের সাহিত্য-সাংবাদিকতায় উৎসাহ দানে, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে এবং রাজনৈতিক তৎপরতা ও আজাদী আন্দোলনে সকল দিকে তিনি এ দেশে ইসলামী রেনেসাঁ সৃষ্টির কাজ করে গেছেন।

আজাদী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল বাংলার সকল আলেমের চাইতে অধিক। বাংলার প্রত্যেক মুসলিম নেতাকেই রাজনৈতিক ব্যাপারে বাঙ্গালী মুসলমানদের সমর্থন পাওয়ার জন্যে তাঁর শরণাপন্ন হতে হয়েছে। এমন কি হিন্দু নেতারাও তাঁর কাছে যেতেন। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন দূরদর্শী। একবার মিষ্টার গান্ধী, সি, আর দাস, মওলানা মুহাম্মদ আলী যখন অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্যে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন, তখন তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন যে, "আমি প্রথমে কোরান-হাদীসের পক্ষপাতী। কংগ্রেস এর কোনো একটির বিরুদ্ধাচরণ করলে কখনও আমার সহযোগিতা পাবে না।" তিনি আরও বলেছিলেন– "ঘর পোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পায়, তেমনি আমি আপনাদের সঙ্গে (হিন্দুদের) সহযোগিতা করতে ভয় পাই। কেননা, সিপাহী বিদ্রোহের সময় যখন হিন্দুগণ সমস্ত দোষ গরীব মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়ে পলায়ন করলো, তখন সে বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ বহু মুসলমানের প্রাণ হানি ঘটেছিল। সে সব কথা স্মরণ হলে আমার শরীর শিউরে উঠে। তাই হিন্দু-মুসলমান একতাবদ্ধ হতে হলে হিন্দুদেরকে মুসলমানদের দাবি-দাওয়া মেনে নিতে হবে।"

এ জবাবে হিন্দু নেতারা নিরাশ হলে তিনি তাদের অজ্ঞাতসারে মওলানা মুহাম্মদ আলীকে বললেন, "আমি কংগ্রেসের প্রতি আস্থা আনতে পারি না। তাদের চেহারার হাবভাব দেখে আমার সন্দেহ হয়। আপনাকে আমি এ উপদেশ দিচ্ছি, যাই করুন

আগে দ্বীন, পরে দেশ। দ্বীন ছেড়ে দিয়ে দেশ উদ্ধার করা আমাদের কাম্য নয়। আমার একথাগুলো স্মরণে রাখবেন। আমি প্রথমে মুসলমান পরে ভারতবাসী।" তিনি সব সময় বলতেন, "শরীয়তবিরোধী যা-ই হোক না কেন, নিশ্চয়ই তার প্রতিবাদ করতে আমি কখনও পশ্চাদপদ হবো না। আবু বকর আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় করে না।"

বিচক্ষণ মওলানা আবু বকর সাহেব তাঁর এই দ্বিজাতিতত্ত্ববোধের কারণেই জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ কংগ্রেসকে সমর্থন করায়, তা থেকে বের হয়ে আসেন এবং বাংলার আলেম সমাজকে রাজনৈতিক দিক থেকে সংঘবদ্ধ করার জন্যে "জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গাল ও আসাম" গঠন করেন। তিনি খেলাফত আন্দোলনকালে বহু অর্থ চাঁদা তুলে তুর্কী মুসলমানদের সাহায্য করেছেন। বাংলার মুসলমানদের ভোট পেতে হলে শেরে বাংলা মৌলভী এ, কে, ফজলুল হক অনেক নেতাকেই ফুরফুরার পীর সাহেবের সমর্থন নিতে হতো।

মওলানা আবু বকর সিদ্দীক প্রথমে রাজনীতিতে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু যখন দেখলেন যে, কাউন্সিল তথা আইন পরিষদে ইসলামের শরীয়তবিরোধী আইনসমূহ পাশ হচ্ছে, তখনই তিনি ইসলামপন্থী দ্বীনদার মুসলমান ও আলেমদেরকে আইন সভায় পাঠানোর তীব্র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ৪৭ পূর্বে যুক্ত বাংলার 'ব্যবস্থা পরিষদে' বেশ কয়জন আলেম সদস্য ছিলেন। ফেনীর মওলানা আবদুর রাজ্জাক, মওলানা ইব্‌রাহীম ও মওলানা আবদুল জাব্বার খদ্দর প্রমুখসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার যেসব আলেম তখন যুক্ত বাংলা আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন, তাঁদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের পেছনে মূলতঃ এই চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গিই কাজ করেছিল।

বস্তুতঃ বাংলা-আসামে মুসলিম লীগের যে জনপ্রিয়তা ছিল, তার উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ফুরফুরার পীর সাহেবেরই। তিনি এ দেশের বাঙ্গালী মুসলমানের মনে মুসলিম স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন, তা চিরদিন এদেশের ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে। তেমনি বাঙ্গলার আলেম সমাজও তাঁর এই আদর্শ থেকে আজীবন প্রেরণা লাভ করবে। তাঁর ইন্তেকালের এক বছর পরই ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলমানদের জন্যে আলাদা রাষ্ট্রের প্রস্তাব গ্রহণ করে।

ফুরফুরার পীর সাহেবের ইন্‌তেকালের পর বাংলা-আসামে তাঁর যেসব শিষ্য অনুসারী ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ বিস্তারে কাজ করেন, তাদের মধ্যে শর্ষিণার পীর মওলানা ছুফী নেছারুদ্দীন সাহেব, ছুফী ছদরুদ্দীন সাহেব, মওলানা রুহুল আমীন

সাহেব, প্রফেসার আবদুল খালেক সাহেব এবং ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সাহেব, মওলানা মুয়েযুদ্দীন হামীদী সাহেব প্রমুখের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র পীর মওলানা আবদুল হাই ছিদ্দিকী তাঁর অনুগামীদের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হন। পাকিস্তান আন্দোলনকালে ফুরফুরার পীর সাহেবের এসব খলীফা ও তাঁর লক্ষ লক্ষ মুরীদের অপরিসীম ত্যাগ রয়েছে। এমন দিনও গিয়েছে, মুসলিম লীগ ও পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তানের সপক্ষে বাঙ্গালী মুসলমানদের সমর্থনের জন্যে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় আলেমদের ফতওয়া ও অভিমত প্রকাশ না করলে এ দেশের মানুষ রাজনৈতিক ব্যাপারে কোনো নেতাকে তেমন সমর্থন জানাতেন না।

পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হলে মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী ও কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ যখন তাঁর প্রতি সহযোগিতার আহবান জানান, তখন ফুরফুরার পীর সাহেবের সুযোগ্য পুত্র মওলানা আবদুল হাই ছিদ্দিকী ও তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য মওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ সহ ফুরফুরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অসংখ্য ওলামা ও সাধারণ মুসলমান এ ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

শর্ষিণার পীর মওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ সাহেব

বিশেষ করে শর্ষিণার পীর মওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ সাহেব ও ফুরফুরার পীর মওলানা আবদুল হাই ছিদ্দীকী মুসলিম লীগ ও জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে এ দেশের মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছাবার জন্যে তৎপর ছিলেন। ফুরফুরার বড় পীর সাহেব কর্তৃক স্থাপিত "জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গাল ও আসামে"র তরফ থেকে মুসলিম লীগ নেতাদের কাছে ইসলামী চরিত্র গঠনের জন্যে তারা চাপ সৃষ্টি করতেন। এ প্রত্যেকটি বিষয়ই ছিল আলেম সমাজের জন্যে প্রেরণার বিষয়। সিলেটের গণ-ভোটের প্রাক্কালে শর্ষিণার পীর সাহেব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন, না জানি সিলেটের মুসলমান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে বসে। এ আশংকায় তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ ছাহেবসহ বহু ভক্তকে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে সিলেটে প্রেরণ করেন।

পাকিস্তান আন্দোলনের ব্যাপারে শুধু রাজনৈতিক সুবিধাই যে মানুষ কামনা করেনি এবং আলেম সমাজ পাকিস্তান আন্দোলনে শরীক না হলে যে এ দেশের মুসলমানদের ভিন্নমত প্রকাশের সম্ভাবনা ছিল, শর্ষিণার দূরদর্শী পীর নেছারুদ্দীন সাহেব কর্তৃক কায়েদে আযমকে লিখিত একটি চিঠি থেকেও তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তাহলো ঃ

"মুসলিম লীগ আজ যতোখানি রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করতে সমর্থ হইয়াছে, সেই পরিমাণ ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করিতে সমর্থ হয় নাই। এই কারণে জনসাধারণ মুসলমানদের জন্যে আলাদা রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' শব্দ বার বার শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিলেও ইহা তাহাদের কতোখানি আপনার জিনিস শুধু রাজনৈতিক সুবিধা লাভের ভিতর দিয়া তাহারা ইহা ভাল বুঝিতে পারে না– তাহারা ইহা বুঝিতে চাহে ধর্ম ও নৈতিক উন্নতির স্বীকৃতির ভিতর দিয়া আর ইহা কার্যতঃ কিভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে তাহাও কাজের ভিতর দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে।"

বস্তুতঃ ভারতের বিভিন্ন এলাকার মুসলমানদের এজাতীয় জিজ্ঞাসার জবাব হিসাবেই কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ পাকিস্তান, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র, এ দেশের অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে বার বার ইসলামী শাসনব্যবস্থা ও কুরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের ওয়াদা করেছিলেন। এ কারণেই দেখা যায়, ১৯৪৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ওলামা সম্মেলনে কায়েদে আযম তাঁর দক্ষিণ হস্ত মওলানা যাফর আহ্মদ আনছারীর মাধ্যমে প্রেরিত পয়গামে পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র করার ওয়াদা প্রদান করেন।

মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী

আজাদী আন্দোলনে বাংলাদেশের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, ইসলামী চিন্তাবিদ, বিচক্ষণ রাজনীতিক নেতা ছিলেন মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী। মওলানা বাকী প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা কাফীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। উভয় ভ্রাতাই উপমহাদেশের মুসলিম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। জাতির সার্বিক কল্যাণ-চিন্তায় মওলানা কাফীর ন্যায় মওলানা বাকীও ছিলেন নিবেদিত। তিনি অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য করে আন্দোলনে জড়িত হয়ে এ দেশ থেকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ অওয়াজ তোলেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে তাঁকেও অতিরিক্ত জেল ভোগ করতে হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে তিনি তৎকালীন বঙ্গবন্ধু –শেরে বাংলা মৌলভী এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের প্রজা আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩৪ সালে মওলানা বাকী ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। এবং দেশবাসীর অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি সে সময় কৃষক শ্রমিক প্রজা পার্টির সহ-সভাপতি হিসাবে জনগণের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম করতেন। মওলানা বাকী ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করে একে অধিক জোরদার করে তোলেন। ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার ব্যবস্থা পরিষদের তিনি সদস্য ছিলেন। মওলানা বাকী আজাদী

আন্দোলনে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন, তার দীর্ঘ বিবরণ এখানে সম্ভব নয়। তিনি আজাদী-উত্তরকালেও মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৫২ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বার্ধক্যে পৌছে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন।

পীর বাদশাহ্ মিঞা (১৮৮৪–১৯৫৯ খৃঃ)

আজাদী আন্দোলনের অন্যতম বীর সেনানী শরীয়তের নিশানবরদার ফরিদপুরের পীর বাদশাহ্ মিঞার দান মুসলিম বাংলার আজাদী সংগ্রামের ইতিহাসেই কেবল নয়, এখানকার ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ইতিহাসে চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে। জাতির এ মহান নেতার অপূর্ব চারিত্রিক দৃঢ়তা, অধ্যাত্মিক শক্তি-সাহসের বদৌলতে এ দেশের মুসলিম সমাজ থেকে শিরক, বেদায়াত ও যাবতীয় অনৈসলামিক রীতিনীতি ও কুপ্রথা বহুলাংশে দূরীভূত হয় এবং ইসলামের বৈপ্লবিক শক্তিবলে পরাধীনতার জিঞ্জিরমুক্ত হবার জন্যে দেশবাসীর মধ্যে ইংরেজ বিতাড়নের মধ্য দিয়ে আজাদী হাসিলের স্পৃহা বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ায়। এ মহান নেতার কর্মবহুল সংগ্রামী জীবনের বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব না হলেও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা একান্ত প্রয়োজন।

মুসলিম বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পীর বাদশাহ্ মিঞার অবদানের ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ইসলামী আন্দোলনের পথিকৃৎ মহান বিপ্লবী নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহ্র উত্তরাধিকারী পীর বাদশাহ্ মিঞা তাঁর কর্মজীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহ্র যোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে প্রমাণিত করে গেছেন। উপমহাদেশের মুসলমানদের মুক্তি আন্দোলনের বংশানুক্রমিকভাবে তিনি উত্তরাধিকারী হওয়াতে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে নির্ভীকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাংলার আনাচে-কানাচে ঝটিকা সফর করে তিনি তাঁর লাখ লাখ মুরীদ নিয়ে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯২১ সালে পীর বাদশাহ্ মিঞা খেলাফত আন্দোলনে জড়িত হন এবং ইংরেজ সরকার তাঁকে কারাগারে আবদ্ধ করে। দীর্ঘ দু'বছর তিনি কারাগারে অতিবাহিত করেন। এই নির্ভীক মোজাহিদ কারা-নির্যাতনে এতটুকুও দমেননি। বরং ইংরেজ সরকারের কবল থেকে বাংলাদেশ তথা গোটা উপমহাদেশের মানুষকে মুক্ত করার জন্য তিনি জনগণকে আজাদী আন্দোলনে উদ্বেলিত করে তোলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দেশের একনিষ্ঠ সভাব গুনে বাদশাহ মিঞা ইচ্ছা করলে

সহজেই প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য হতে পারতেন; কিন্তু তিনি ক্ষমতায় না গিয়ে নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবা করেছেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বশ করার জন্য বহুবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। তিনি ব্যক্তিস্বার্থে রাজনীতি করাকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। ১৩২৮ বাংলায় মাদারীপুর মহকুমার প্রধান প্রশাসকও কতিপয় ইংরেজ তাঁকে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বশ করার জন্য বহুবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। তিনি ব্যক্তিস্বার্থের জন্য রাজনীতিকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। ১৩২৮ বাংলায় মাদারীপুর মহকুমার প্রধান প্রশাসক কতিপয় ইংরেজ তল্পীবাহক নিয়ে তাঁর বৈঠকখানায় উপস্থিত হন এবং ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত থাকার আহবান জানান। অন্য পীরদের মতো রাজনীতি বাদ দিয়ে শুধু ওয়াজ-নছীহত করতেই মহকুমা প্রশাসক তাঁকে পরামর্শ দেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন, উপমহাদেশ থেকে ইংরেজ যালেম সরকারকে বিতাড়িত করা এবং দেশবাসীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা তাঁর একটি ধর্মীয় পবিত্র কর্তব্য। মহকুমা এস, ডি, ও তাঁকে বশে না আনতে পেরে আর একটি বিরাট টোপ দেখানঃ ইংরেজ সরকারের খাস মহল বিভাগ থেকে তাঁকে আট হাজার বিঘা লাখেরাজ ভূমি ও তাঁকে একজন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেয়া হবে। তাঁর বাহাদুরপুর বাসভবন প্রাঙ্গনে ফৌজদারী ও আদালতী বিচার কোর্ট এবং তাঁকে একটি শ্রেষ্ঠতম তমগা দেয়ার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু ত্যাগী সংগ্রামী নেতা পীর বাদশহ মিঞা তখন ঘৃণাভরে এসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন ও রাগতস্বরে বলেছিলেন, "ধন-সম্পদ ও পার্থিব সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামের দুশমন যালেম প্রভুদের সুযোগ দেওয়া কাপুরুষের কাজ। আমি কাপুরুষ নই। কাপুরুষের বংশে জন্ম নেইনি। আমার পূর্বপুরুষগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাদের কারাগারে কঠিন যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। আমি সেই জালেমশাহী খতম করতে জানমাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তাদের আনুগত্য ও দাসত্ব স্বীকার কিছুতেই আমার দ্বারা সম্ভব নয়।"

চট্টগ্রামের মওলানা কাসেম আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মহানগরী কলকাতায় খেলাফত কমিটির অধিবেশন থেকে এসে পীর বাদশাহ্ মিঞা পূর্বাপেক্ষা অধিক সংগ্রামী হয়ে ওঠেন। সে অধিবেশনে তিনি সি, আর, দাসের সঙ্গেও আজাদী আন্দোলনের ব্যাপারে আলোচনা করেন। দেশে প্রত্যাগমন করে তিনি বাংলার গ্রাম, গঞ্জ, শহর, বন্দরে বিরাট বিরাট সভা করে ইংরেজবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। প্রথমে তিনি মাদারীপুরে ১৯২১ খৃঃ ২৮শে আগষ্ট বিরাট

সভা করেন। দ্বিতীয় ঐতিহাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯২১ খৃঃ ২রা সেপ্টেম্বর বরিশাল হাইস্কুল প্রাঙ্গনে। এতে খেলাফত কমিটির প্রতিষ্ঠাতা অবিভক্ত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা মওলানা মুহাম্মদ আলী, মওলানা আজাদ সোবহানী, কংগ্রেস নেতা মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী, শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গ্রেফতারী

পীর বাদশাহ্ মিঞা ঐ সালেই ৭ই সেপ্টেম্বর ১০৮ ধারা আইনে গ্রেফতার হন। তাঁকে গ্রেফতার করে নেয়ার সময় মাদারীপুর এস, ডি, ও'র বাসায় বসানো হয়। এখানেও রাজনৈতিক আন্দোলন হতে বিরত থাকার জন্য তাঁকে বুঝান হয় এবং একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিতে অনুরোধ জানান হয়। তাকে এস, ডি ও রাত্রে তার বাসভবনে আহার করতে অনুরোধ জানালে তিনি জবাব দেনঃ আমি আপনার অতিথি নই। কাজেই আপনার খাদ্য খাব কেন? জেলখানার খাদ্যই আমার যথেষ্ট। পরদিন পুলিশ অফিসার তাঁকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নতি স্বীকার করতে বললে তিনি এই প্রস্তাবও প্রত্যাখান করেন। মাদারীপুর কারাগার থেকে তাঁকে ফরিদপুর কারাগারে নেয়ার পথে জনতা রাস্তায় রাস্তায় ভীড় জমায় এবং ইংরেজ-বিরোধী শ্লোগান দিতে থাকে। তিনি নির্ভীকভাবে অপেক্ষমান সারিবদ্ধ জনতাকে আন্দোলন জোরদার করার আদেশ দেন এবং ভগ্নোৎসাহ হতে নিষেধ করেন। তিনি মওলানা মুহাম্মদ আলীর অমরবাণী– 'কতলে হোসাইন আছল মে মুরগে ইয়াজিদ হ্যায়, ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালাকে বাদ' এই বলে অনুপ্রাণিত করেন। অবশেষে তাঁকে আলীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে নেয়া হয়। তার অল্পদিন পরে অবিভক্ত ভারতের প্রখ্যাত সংগ্রামী আলেম দেশপ্রেমিক মওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ, মওলানা আবদুর রউফ দানাপুরী, সি, আর, দাস, জে, এম, সেন চৌধুরী, নোয়াখালীর আবদুর রশীদ খান, মৌঃ শামসুদ্দীন আহমদ, মওলানা আজাদ, করটিয়ার জমিদার চাঁন্দ মিঞা প্রমুখ হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দকে আলীপুর সেন্টাল জেলে বন্দী করে আনা হয়। এতে নেতৃবৃন্দের ভবিষ্যত কর্মসূচীর উপযুক্ত পরামর্শ কেন্দ্র মিলে।

পীর বাদশাহ্ মিঞাকে এত নির্যাতন ও লোভ-প্রলোভন দিয়েও তাঁকে রাজনীতি থেকে বিরত না করতে পারার একমাত্র কারণ এই ছিল যে, তিনি মনে করতেন– রাজনীতির সঙ্গে ইসলামের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। বরং এটা ইসলামের একটি শক্তিশালী অঙ্গ। ঈমান-আকীদা, ইবাদাত, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতির সমষ্টির নামই ইসলামী রাজনীতি।

পীর বাদশাহ মিঞা তাঁর সমসাময়িক প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে শেরেবাংলার কৃষক প্রজা পার্টিরও তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

১৯৪০ সাল ঐতিহাসিক পাকিস্তানের প্রস্তাব গৃহীত হলে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দেশ স্বাধীন হবার পর একে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য তিনি জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলাম ও নেযামে ইসলাম পার্টির সঙ্গে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম লীগ ইসলামের ব্যাপারে ওয়াদা খেলাফী করলে তিনি লীগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্ত-ফ্রন্টের সপক্ষে তিনি নিজের অনুসারীদের নিয়ে অন্যতম অঙ্গদল নেযামে ইসলামের পক্ষ হয়ে মুসলিম লীগকে তার ওয়াদা খেলাফীর পরিণতি বুঝিয়ে দেন। কেননা, ঐ নির্বাচনেই মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটেছিল। যা হোক, অতঃপর এই মহান সংগ্রামী নেতা ইসলামী রাষ্ট্রের আকুল আগ্রহ বুকে নিয়ে ১৯৫৯ খৃঃ ১৫ই ডিসেম্বর মাসে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী

মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী আজাদী আন্দোলনের অন্যতম সংগ্রামী বীর ছিলেন। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিক ও সমাজ সংস্কারক যুক্তিবাদী বিচক্ষণ আলেম ছিলেন। এক হিসাবে বলা চলে বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় চেতনা সৃষ্টিকল্পে সাহিত্য সাংবাদিকতা, পুস্তক রচনা তথা সাংস্কৃতিক দিক থেকে যে কয়জন আলেম নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে মওলানা কাফী অন্যতম অগ্রপথিক। এই ইসলামী চিন্তাবিদ কলিকাতা মাদ্রাসার অ্যাংলো-পারসিয়ান বিভাগ থেকে ১৯১১ সালে বি, এ, পাশ করে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রথম শ্রেনীর রাজনীতিক মওলানা আবুল কালাম আযাদের সংস্পর্শে যান। সে সময় মওলানা আযাদ মাসিক 'আল-হেলাল' পত্রিকার সম্পাদক। মওলানা আযাদের নিকট রাজনৈতিক প্রেরণা লাভ করে তিনি মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টিকল্পে 'পূর্ববাংলায়' আসেন। এখানে কিছুকাল সভা-সমিতির মাধ্যমে মুসলমানদের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে পথনির্দেশ না দিয়ে তিনি পুনরায় কলকাতা চলে যান। মওলানা আকরাম খাঁর সম্পাদনায় খেলাফত কমিটির উর্দু দৈনিক 'যামানা' পত্রিকায় তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর সম্পাদকীয় প্রকাশের অভিযোগে মওলানা আকরম খাঁ ও পত্রিকার সহ-সম্পাদক শেখ আহ্‌মদ ওসমানী গ্রেফতার হলে তিনি ১৯২২ সালে 'যামানার' সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী আল-কোরাইশী ১৯২৪ হইতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত 'সত্যাগ্রহী' পত্রিকার সম্পাদক ও ব্যবস্থাপক

ছিলেন। সে সময়ও ঐ পত্রিকার মাধ্যমে তিনি এ দেশবাসীর সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে তুলে ধরতেন। অতঃপর তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন এবং ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট মুসলিম পার্টিতে শরিক হয়ে তাঁর সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন।

মওলানা কাফী এ দেশবাসীকে ইংরেজের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ১০৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে বাংলাদেশে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে মুক্তি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে পুনরায় ৬ মাসের জন্য কারাগারে অবদ্ধ করে রাখে।

মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় মুসলিম কনফারেন্সেও যোগদান করেছিলেন। আজাদী আন্দোলনের এই সংগ্রামী নেতা দেশ স্বাধীন হবার পর একে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য রুগ্ন শরীর নিয়েও আপ্রাণ চেষ্টা করেন। আজাদী উত্তরকালে বরং তার কিছুকাল পূর্ব থেকেই তিনি এই উদ্দেশ্যে পরিবেশ সৃষ্টিকল্পে মসীযুদ্ধের প্রতি অধিক মনোনিবেশ করেন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ঢাকা থেকে তিনি ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা সমৃদ্ধ মাসিক 'তারজুমানুল হাদীস' প্রকাশ করেন। ১৯৫৭ সালে মওলানা কাফী সাহেব একই স্থান থেকে সাপ্তাহিক আরাফাত প্রকাশ করেন। নানা অসুবিধায় মাসিক 'তারজুমানুল কোরআনের' প্রকাশ কিছুদিন যাবত বন্ধ থাকলেও সাপ্তাহিক আরাফাত এখনও মওলানা কাফীর স্মৃতি নিয়ে ইসলামী জ্ঞান-পিপাসুদের খোরাক সরবরাহ করে যাচ্ছে। বার্ধক্যে কঠিন রোগে আক্রান্ত থেকেও অবিভক্ত পাকিস্তানকে শোষণহীন ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার জন্য তিনি কিরূপ উদ্বিগ্ন ছিলেন, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা রাগেব আহ্সানের নিম্নোক্ত লেখাটি থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেঃ

"পাকিস্তান শাসনতন্ত্র কমিশনের প্রশ্নমালা সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য তিনি আমাকে তাঁর দু'জন প্রতিনিধি দ্বারা ডেকে পাঠান। আমি ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁর খেদমতে হাযির হলে তিনি বললেন, পিত্তশূলের বেদনার জন্য যে অপারেশন করেছিলাম, তা বিফল হয়েছে। পিত্তকোষে কোন পাথরের সন্ধান পাওয়া যায়নি। বেদনা আগের মতই বর্ধিত হয়েছে। .....কিন্তু পাকিস্তানের অবস্থা আমাকে পানি থেকে তীরে নিক্ষিপ্ত অসহায় মৎস্যের ন্যায় বিচলিত করে তুলেছে। পাকিস্তানকে একটি সেক্যুলার স্টেটে পরিণত করার যে অপচেষ্টা শুরু হয়েছে, সে দৃশ্য অবলোকন করে আমি কিছুতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পাচ্ছি না। এখন শাসনতন্ত্র কমিশনের

প্রশ্নমালার উত্তর দেয়া একান্ত আবশ্যক। এ ব্যাপারে আমি আপনার পরামর্শ ও সাহায্য কামনা করি। আমি বললাম, বান্দা খেদমতের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দেশের বিশিষ্ট আলেম এবং চিন্তাশীল সুধীবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত, বিশেষ করে যারা ১৯৫১ এবং ৫৩ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত ওলামা সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। কাফী সাহেব বললেন, এ ধরনের বৈঠকে দীর্ঘসূত্রতার আশঙ্কা আছে। তবে ঢাকা শহরে অবস্থারত চিন্তাবিদ ও আলেমগণের তরফ থেকে যদি প্রশ্নমালার উত্তর দেয়া যায় তা হলেই যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে। ২৬শে মে রাত্র ১১টায় শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের উপর দীর্ঘ আলোচনা চলে। ......তিনি বেদনার ভাব অনুভব করলেন। তাঁর গায়ে জ্বরও এসে গেছে। তাঁর প্রস্তাবেও সকলের সম্মতিতে আমার উপরই কমিশনের প্রশ্নমালার বিস্তৃত জবাবসহ একটি খসড়া প্রস্তুতির দায়িত্ব অর্পিত হয়। ......পরবর্তী ৩রা জুন ওলামা ও সুধীবৃন্দের একটি বৈঠকে তা পেশ করতে হবে। ..... মওলানা সাহেব আমাকে বার বার একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন, ইসলাম ও গণতন্ত্র, দেশ ও মিল্লাত এই উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণিত ও যুক্তিসিদ্ধ জবাব লিখতে হবে। ..... আমি অনুরোধ করলাম, এমন একটি গুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনিও যেন তাঁর লিখনী ধারণ করেন। তিনি অসুস্থতার ওজর দেখালেও শেষ পর্যন্ত নীম রাযি হলেন। .....আমার নিবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি নিজেও প্রশ্নমালার উত্তর লিখতে বসে গেলেন। যদিও সে সসয় তাঁর পিত্তশূল ক্রমে বেড়ে চলেছিল। কিন্তু দেখা গেল, মওলানা সাহেব তাঁর শয্যার সঙ্গে সংযুক্ত একটি ক্ষুদ্র টেবিলে কেতাবপত্র সংস্থাপন করে লিখে চলেছেন। ডান হাতে অবিরাম গতিতে কলম চলেছে। বাম হাত বক্ষদেশে বেদনাস্থল চেপে রেখেছে। মাঝে মাঝে বেদনার অনুভূতি যখন সহ্যসীমার বাহিরে চলে যাচ্ছে, তখন হাত দিয়ে ডলা শুরু করেছেন। এভাবে দুই বেদনার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হলো।

একদিকে শরীরের অভ্যন্তরে পিত্তবেদনা, অন্যদিকে মিল্লাতের জন্য তাঁর অন্তরবেদনা–দুই বেদনায় তুমুল সংগ্রাম। আল্লাহ্র মনোনীত বান্দাহ মওলানা কাফীর অটল সংকল্প ঃ তিনি তাঁর আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করেই উঠবেন–'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।' ১লা জুন ১৯৬০ খৃঃ। জমঈতের (আহলে হাদীস) অফিস সেক্রেটারী মৌলভী মীযানুর রহমান বি, এ, বি, টি সাহেব উপরে এসে মওলানা সাহেবকে উপরোক্ত অবস্থায় দেখে আরয করলেন ঃ হযরত নিজের শরীরের উপর রহম করুন। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু খেয়াল দিন! ডাক্তারের কড়া নির্দেশ

-শরীরকে আরাম দিতে হবে। মওলানা সাহেব উত্তর করলেন ঃ আপনাদের মুখে ঐ কথা -স্বাস্থ্য; কিন্তু আমি স্বাস্থ্যের দিকে কি নজর দিব, এখন আমার জানেরএকই ও কোন পরওয়া নাই। সমস্তই পাকিস্তান ও ইসলামের জন্য উৎসর্গীকৃত। এখন আপনি যান। নিচে গিয়ে দফতরের কাজ দেখুন, আমাকে আমার কাজ করতে দিন।"

এই বলে আগের অবস্থায়ই......কমিশনের ৪০টি প্রশ্নের মধ্যে ৩৮টির জবাব লিখার পর একদম অবশ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেন। বেদনার তীব্রতায় অনুভূতিহীন ও শক্তিহারা অবস্থায় মেঝের উপর স্থাপিত পালঙ্কে নিপতিত হলেন আর এই পড়াই তাঁর শেষ পড়া।"

১৯৬০ সালের ৩রা জুনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগ পর্যন্ত ইসলামী শাসনতন্ত্র, পাকিস্তান ও মুসলিম মিল্লাতের চিন্তা মওলানা আবদুল্লাহিল কাফির সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মওলানা রাগেব আহসান তাঁর লেখাটির শিরোনাম এজন্যই দিয়েছিলেন-'হযরত আল্লামা কাফীর শাহাদাত কাহিনী।' সত্যই তিনি ইসলাম, পাকিস্তান ও মুসলিম জাতির জন্য নিজের স্বাস্থ্যকে বিলীন করে শাহাদাতের অমিয় সুধাই পান করেছিলেন।

যা হোক, এভাবে উপমহাদেশের আলেম সমাজ বহু ত্যাগ ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ভারত-বিভাগ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে আজাদী আন্দোলন চালিয়ে যান। অতঃপর ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট ভারত বিভাগের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের অধিবাসিগণ দীর্ঘ দু'শো বছরের গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্তি পায়। আজ তারা নিজেদের স্বাধীন আবাস ভূমিকে ইসলামী মূল্যবোধে গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত। পাক-ভারতের আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের এই দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের কথা মুসলমানরা তো নয়ই এমনকি এ দেশের অমুসলমানরাও যদি ভুলে যায়, তা হলে পৃথিবীর ইতিহাসে এটা হবে এক চরম অকৃতজ্ঞতা।

আজাদী আন্দোলনের নির্ভীক সিপাহ্সালার
মওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানী

মওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানী ওরফে মওলানা ভাসানী হচ্ছেন রূপকথার নায়ক তুল্য বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অমিত তেজা বিমূর্ত ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন আজাদী আন্দোলনের নির্ভীক সিপাহ্সালার। দেশ জাতি ধর্মের মর্যাদা রক্ষা, জনগনের ন্যায্য অধিকার ও দাবী দাওয়া আদায়ের সংগ্রামে তিনি একাধিকার কারাবরণ করেন। তিনি ছিলেন শোষিত বঞ্চিত নির্যাতিত মানুষের কণ্ঠস্বর। ইসলামের এক অনাড়ম্বর খাদেম। বাংলাদেশের বৃহত্তর পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের ধনগরা নামক গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। মওলানা ভাসানীর পিতা মরহুম হাজী শারাফত আলী ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁর পেশা ছিল চাষাবাদ। মওলানা ভাসানী চাষী পরিবারে জন্ম লাভ করে চাষীদের পরিবেশেই বেড়ে ওঠেন, গড়ে ওঠেন, যেই চাষীরা বেঁচে থাকার তাগিদে অপরিসীম কষ্ট পরিশ্রম ও সংগ্রাম সাধনার মধ্যে নিজেদের সদা নিয়োজিত রাখেন। যুবক ভাসানীর ভবিষ্যত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিতে পরিবেশগত তাঁর এই অবস্থান সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

মুসলিম পারিবারিক শিক্ষার ঐতিহ্যগত প্রথা অনুযায়ী মওলানা ভাসানী প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তবে তিনি সৌভাগ্যক্রমে শাহ্ সূফী নাসিরুদ্দীন বাগদাদীর ন্যায় একজন আধ্যাত্মিক শিক্ষকের সাহচর্য ও লাভ করেন। বাগদাদী ছিলেন একজন সুবিখ্যাত আধ্যাত্মিক নেতা। বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী শিক্ষার পাদপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দের সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস এবং উপমহাদেশের অন্যতম সুপরিচিত রাজনীতিক আজাদী সংগ্রামের নির্ভীক সেনানী মরহুম মওলানা হোসাইন আহ্মদ মাদানীর সাহ্চর্যেও মরহুম মওলানা ভাসানী দু'বছর অতিবাহিত করেন। শাহ্ সূফী বাগদাদীর ন্যায় আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের সংসর্গ এবং কুরআন সুন্নাহ্র জ্ঞানে পরিপক্ক মহা পন্ডিত ও বুজর্গ মাওলানা মাদানীর সাহচর্য ভাসানী চরিত্রকে জাগতিক আধ্যাত্মিক উভয় বৈশিষ্টে করেছিল বিমন্ডিত।

রাজনৈতিক ভবিষ্যতঃ বর্তমান শতকের প্রথম দশকে মওলানা ভাসানী ট্যারোরিষ্ট মোভমেন্টের সাথে জড়িত ছিলেন। এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল সংগ্রামের মাধ্যমে ভারত থেকে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটানো। এই শতকের দ্বিতীয় দশকে তিনি খেলাফত আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসাবে আজাদী সংগ্রামে রত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে খেলাফত আন্দোলনের নেতা মওলানা মুহাম্মদ

আলীর সাথে কাজ করার তাঁর সুযোগ ঘটে। খেলাফত আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকার কারণে মওলানা ভাসানী বৃটিশ শাসকদের দ্বারা কারানির্যাতন ভোগ করেন। ১৯২৩ সাল থেকে খেলাফত আন্দোলন অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে । পরন্তু দেশবন্দু চিত্তরঞ্জ দাসের মৃত্যুতে (১৯২৫) স্বরাজ পার্টীর নীতিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এই দুটি ঘটনার পর রাজনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে মাওলানা ভাসানী নতুন ধারা গ্রহণ করেন। এসময় তার রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল অবহেলিত বাংলা আসামের গ্রামীণ জীবনকেন্দ্রিক।

১৯৩০ সালে মওলানা ভাসানী বাংলা- আসামের লক্ষ লক্ষ কৃষকের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত কৃষক আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ১৯২৪ সালে ভাসান চরে অনুষ্ঠিত বাংলা - আসামের জিরাতিয়া প্রজাদের এক ঐতিহাসিক সম্মেলনের মধ্যদিয়ে মওলানা ভাসানী কৃষক আন্দোলনের সূচনা করেন। শোষক সামন্তবাদী জোৎদার মহাজন শ্রেণীর বিরুদ্ধে মুসলিম চাষী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী ১৯৩০ সালে বাংলা আসামের মুসলমানদের এক বিরার্ট সম্মেলনের আয়োজন করেন। তৎকালীন বৃহত্তর মোমেনশাহী জেলার সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানী ১৯৩১ থেকে ১৯৩২ সালে ডাইরেক্ট একশনের লক্ষ্যে চাষী সাধারণকে সংগঠিত করেন। এসব তৎপরতার কারণে ১৯৩২ সালের প্রথম দিকে বৃটিশ সরকার এ জেলায় তাঁর তৎপরতা বন্ধ করে দেয়।

১৯৩৭ সালে অল ইন্ডিয়া লক্ষ্ণৌ কনফারেন্সের অব্যবহিত পূর্বে মুসলিম লীগ নেতা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং রাজা গজনফর আলীর অনুরোধে মওলানা ভাসানী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। সিলেট জেলা গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে মিলিত হয়েছিল। গণভোটে সিলেটবাসীরা যেন আদৌ কোন ভুল না করেন সেজন্য মওলানা ভাসানী সারা সিলেটে ঝটিকা সফর করে পাকিস্তানের সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করেন। ৪৭- এর আজাদী আন্দোলনে এই সংগ্রামী নেতার রয়েছে অসামান্য অবদান।

১৯৪৮ সালে তিনি উত্তর টাঙ্গাইল থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার তাদের দলীয় মেনিফেস্টো মোতাবেক কাজ না করায় তিন মাস পর তিনি তাঁর সদস্য পদ থেকে ইস্তেফা প্রদান করেন। এক বছর পর তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের মূল ভিত্তি লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নে ক্ষমতাসীন দলের ব্যর্থতার প্রতিবাদে নিখিল পাকিস্তান

মুসলিম লীগের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করেন। উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে স্বতন্ত্র দু'টি মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে উল্লেখ্য করা হয়। এভাবে স্বায়ত্ত শাসিত দু'টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ধারণা থেকে ক্ষমতাসীন সরকার জনগণ থেকে ভোট আদায় করলেও পশ্চিম পাকিস্তানই এর রাজধানী স্থাপন করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা নানান বৈষম্যের শিকার হয়। মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে লাহোর প্রস্তাবকেন্দ্রিক মতবিরোধের ফলে মওলানা ভাসানী মুসলিম লীগের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করেন। মওলানা ভাসানী এই নবগঠিত দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি তাঁর এই সংগঠনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে পারেননি। পাকিস্তানের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক চুক্তি এবং বাগদাদ প্যাক্ট ইস্যুকে ভিত্তি করে নিজদলীয় সহকর্মীদের সাথে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয়। একারণে আবারও তিনি নিজ দল আওয়ামী মুসলিম লীগের সাথে তাঁর রাজনৈতিক যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই দলই আওয়ামী নেতাদের হাতে গিয়ে 'মুসলিম' শব্দ বর্জিত হয়। ১৯৫৭ স্যালে তিনি নতুন দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি হিসাবে ও মওলানা ভাসানীকেই নির্বাচিত করা হয়।

উল্লেখিত বছরগুলোতেও মওলানা ভাসানী দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কৃষকদের স্বার্থেই কাজ করেন। তিনি ১৯৫৭ সালে কৃষক সমিতি নামে কৃষকদের জন্যে একটি স্বতন্ত্র সংগঠন কায়েম করেন। কৃষক সমিতিরও সভাপতি মওলানা ভাসানীই ছিলেন। ১৯৬৭ সালে মওলানা ভাসানী পাকশীতে এক বিরাট কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেন। উক্তসম্মেলনে প্রায় আড়াই লাখ কৃষক অংশ গ্রহণ করেছিল। প্রায় অনুরূপ তিনি আরেকটি বিরাট কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেন ১৯৭০ সালে। এই সম্মেলনেও দুলাখ কৃষক অংশ নেয়। একই সালে তিনি মহিপুরেও এক বিশাল কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেন। মহিপুরের কৃষক সম্মেলনে প্রায় তিন লাখ কৃষক সমবেত হয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে ঘোষনা প্রদানঃ মওলানা ভাসানীই প্রথম ব্যক্তি যিনি পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠেন এবং পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের আহবান

জানান । তিনিই ১৯৭০ সালে নির্বাচিত সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা না দেয়ায় ৪ঠা ডিসেম্বর পল্টন ময়দানের এক জন সভায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে ঘোষণা প্রদান করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর মওলানা ভাসানী লক্ষ্য করেন যে, ঢাকার সরকারতো মূলতঃ বিদেশী রাষ্ট্রের তাবেদার হিসাবে ভূমিকা পালন করছে তখন তিনি আর নিশ্চিন্তে ঘরে বসে থাকতে পারেননি। নিজের সকল আরাম হারাম করে বার্ধক্যকে উপেক্ষা করে আবার তিনি রাজপথে নেমে পড়েন। তিনি দেখলেন, তৎকালীন সরকার ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে মুসলিম প্রধান এ দেশের কৃষ্টি- কালচার ও ধর্মীয় সকল মূল্যবোধ ধংসের কাজ করছে আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা মূলতঃ প্রভু ও পতাকা বদল ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতের স্বার্থ রক্ষা আর বাংলাদেশের মুসলমানদের শোষণেরই ব্যবস্থা হয়েছে, তখন মওলানা ভাসানী ৩০শে জুন ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তার অনুসারীদের সংগঠিত করেন। কিন্তু ক্ষমতাসীন দল মওলানা ভাসানীকে গৃহবন্দী করে রাখে যেন তিনি আন্দোলনের উদ্দেশ্যে কোথাও বের হতে না পারেন।

হুকুমতে রাব্বানী সোসাইটি ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ১৯৪৭ সালে মওলানা ভাসানী যখন বাংলাদেশকে একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার অভিপ্রায়ে হুকুমতে রাব্বানী সোসাইটি গঠন করেন, তখন এই পদক্ষেপ তাঁর জীবনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে । তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে তাঁর নবগঠিত দল- 'হুকুমতে রাব্বানী সোসাইটি' গঠনের মূল দর্শন ব্যাখ্যা করেন। রাজনৈতিক তৎপরতার সাথে সাথে মওলানা ভাসানী তাঁর জনকল্যাণমুখী রাজনৈতিক দর্শনের অনুকূলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য তিনি চিন্তা করেন। মূলত ঃ মওলানা ভাসানী কর্তৃক টাঙ্গাইলের সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তাধারা ও স্বপ্নের বাস্তবায়নেরই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ১৯৫৭ সাল থেকেই তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে চিন্তা গবেষণা করেন আসেন। অবশেষে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়- প্রতিষ্ঠিত হয় সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ।

ঐতিহাসিক ফারাক্কা মার্চঃ মওলানা ভাসানীর সংগ্রামমুখর জীবনের সর্বশেষ ঘটনা ছিল ঐতিহাসিক ফারাক্কা মার্চ। বাংলাদেশে মরু প্রক্রিয়া সৃষ্টিকারী "ফারাক্কা বাঁধ ভেঙে দাও উড়িয়ে দাও" শ্লোগানের মধ্য দিয়ে ১৯৭৬ সালের ১৬ ও ১৭ই মে রাজশাহী থেকে হাজার হাজার লোক নিয়ে ভাসানী লং মার্চ শুরু করেন। সেই লং মার্চের উদ্দীপনাপূর্ণ স্মৃতি প্রতিটি মানুষকে এখনও দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করে।

খোদায়ী খেদমতগার দলঃ ভাসানী জীবনের সর্বশেষ সংগঠনটি ছিল খোদায়ী খেদমতগার। তিনি ১৯৭৬ সালের ১লা অক্টোবর সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসাবে এটির ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি ১৯৭৬ সালে সন্তোষস্থ তাঁর দরবার স্থলে সকল খেদমতগারের উদ্দেশে যেই ভাষণ দেন, সেটিই ছিল এই নেতার জীবনের সর্বশেষ ভাষণ। সেদিন মওলানা ভাসানীর বক্তব্য ছিল, "আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, - যত সব দলই বদল করি না কেন, কোন ফলোদয় হবে না, যদি না শাসকবর্গ চরিত্রবান হয়। আর চরিত্রবান লোকেরাই কেবল আল্লাহর শাসন কায়েম করতে পারে। আমি তাই হুকুমতে রাব্বানীয়ার আশ্রয় নিয়েছি। দোয়া করি, আল্লাহর মর্জি হোক। বিশ্ব মানবতার জয় হোক।"

ইন্তেকালঃ ১৭ই নভেম্বর ১৯৭৬ সালে মওলানা ভাসানী তাঁর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সন্তোষে তিনি চির নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন।

ভাসানী জীবনের শিক্ষাঃ যে কোন সমাজে কোন আদর্শ বাস্তবায়নের দ্বারা ঐ সমাজের কল্যাণ সাধন করতে হলে সেই আদর্শকে প্রথমে সংশ্লিষ্ট সমাজের মানুষের কাছে পরিচিত করতে হয়। উক্ত আদর্শের বাস্তবায়ন দ্বারা জনগনের কি কি কল্যাণ সাধিত হয়, সেটা বোধগম্য ভাষায় তাদের কাছে তুলে ধরতে হয়। অন্যথায় আদর্শের ধারক- বাহকরা সংশ্লিষ্ট সমাজের শত কল্যাণকামী হলেও জনগণ কখনও তাদেরকে নিজেদের শুভাকাঙ্খী মনে করেনা। তাদের প্রতি বাহ্যিক ভাবে সন্মান জানালেও সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের আসনে বসার সুযোগ তাদেরকে কখনও তারা দেবেনা। আদর্শের প্রচারকদের কর্তব্য হলো নিজের কথা, আচার-আচরণ ও একই সংগে চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা জনচিত্তকে জয় করা। বলাবাহুল্য মওলানা ভাসানী তাঁর গোটা সংগ্রামমূখর জীবনে জনপ্রিয়তার যেই উত্তুঙ্গ চূড়ায় সমাসীন ছিলেন, এর

পেছনে তাঁর উল্লেখিত গুণাবলীই কাজ করেছিল। সমাজের সাধারণ মানুষ সব সময় এই অনাড়ম্বর মহান ব্যক্তিত্বকে দেখেছে নিজেদের আপন মানুষ হিসাবে। তাদের দুঃখ দুর্গতির কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলতে এবং এজন্যে দায়ী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ও হুশিয়ারি উচ্চারণ করতে। তারা দেখেছে, ক্ষমতায় না গিয়েও এই নিঃস্বার্থ মজলুম জননেতা সকল সময় তাদের সমস্যাবলী নিয়েই দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সভা করে বেড়াতে এবং অত্যাচারী শাসকদের সন্ত্রস্ত করে রাখতে। সবচাইতে বড় কথা হলো, মওলানা ভাসানী এদেশের মানুষের কল্যাণে তাদেরকে যে কথা বলতেন, তারা সে কথা বুঝতো। পক্ষান্তরে একই 'মওলানা' লকবে ভূষিত আরও বহু আলেম যারা নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা নিঃস্বার্থ ভাবে এ দেশ- জাতির সেবা করে আসছেন এবং তাদের ইহ- পারলৌকিক মুক্তির সন্ধান দিচ্ছেন, তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ দেশবাসীর হৃদয় সে রকম জয় করতে পারেননি, যেমনটি পেরেছিলেন মওলানা ভাসানী। অথচ তাদের মধ্যে ধর্মীয় ও বৈষয়িক বড় বড় এমন পন্ডিতও ছিলেন ও আছেন, যাদের ইলমের পরিধি হয়তো মওলানা ভাসানীর চাইতেও অনেক ব্যাপক ছিল। এর কারণ সম্ভবত সাক্ষাত জনসেবামূলক কাজ ভাসানী অধিক করেছেন আর যা বলেছেন জনগণের সাক্ষাত সমস্যার সমাধানে তাদের বোধগম্য ভাষায় বলেছেন। জনগণের জন্য কথা বলে জেল খেটেছেন।

এদেশের গরীব জনগণের হৃদয় কাংখিত ভাবে জয় করতে অন্য ইসলাম পন্থীরা আশানুরূপ সফল হয়নি। সেটা বলার অপেক্ষা রাখেনা। ব্যর্থতার এই ছিদ্র পথেই আমাদের দেশজাতির বড় সর্বনাশটি সাধিত হয়ে গেছে। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী, নাস্তিকতাবাদীরা ও খৃষ্টান মিশনারী এদেশের কোটিকোটি তওহীদি জনতার সাক্ষাত সমস্যাবলীর সূত্র ধরে কোটিকোটি মুসলমানকে ওলামা নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। কেউ লক্ষ্যে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, কেউ হয়েছে অলক্ষ্যে। এভাবেই আমাদের দেশের ওলামা সমাজ ধীরে ধীরে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন অতঃপর অবহেলিত হয়ে পড়েছেন আর সেই সুযোগে আজ এ জাতির ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ চরম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, যা কিনা দেশের লক্ষ লক্ষ তালেবান ও আলেমানের পক্ষেও এখন ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়ে উঠছেনা। এই আলোকে চিন্তা করলেও সংগ্রামী নেতা মওলানা ভাসানীর জীবন নি:সন্দেহে একটি শিক্ষনীয় জীবন।

সুতরাং আজাদী আন্দোলনের নির্ভীক সেনানী এবং ইসলামী সাম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের অগ্রপথিক, এ দেশের রাজনৈতিক গগনের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর জননেতা মওলানা ভাসানীর সংগ্রাম মুখর জীবন থেকে আজকের ইসলামী আন্দোলনের ওলামা, আধুনিক শিক্ষিত সকলের এমন অনেক কিছু বিষয় শিক্ষনীয় রয়েছে, যে গুলোর অভাবে তারাও এ দেশবাসীর অকৃত্রিম শুভাকাংখী হয়েও এখনও মওলানা ভাসানীর ন্যায় মানুষকে আপন করে নিতে পারেননি। বিশেষ করে জনজীবনের সাক্ষাত সমস্যাবলী যে গুলোর কারণে সাধারণ মানুষ জর্জরিত হচ্ছে, তাদের ঐসব সমস্যা সমাধানে সম্ভাব্য বস্তুগত সাহায্য সহানুভূতি নিয়ে তাদের দ্বারে পৌঁছুতে হবে। তাদের সাহায্যার্থে সাহায্য সংস্থা গঠন করতে হবে। নিছক বেশী বেশী উপদেশাবলী তাদের শোনানোর দ্বারা যতদূর না তাদের চিত্ত জয় করা সম্ভব, ঐ পদ্ধতিতে স্বল্প উপদেশেই তাদের অধিক সাড়া মিলতে বাধ্য। অন্ন বস্ত্রহীন চিকিৎসা বঞ্চিত কর্ম সংস্থানহীন ক্ষুদাক্লিষ্ট মানুষের সামনে খাদ্য-বস্ত্র ও ওষুধের প্যাকেট রাখা কিংবা সেই আয়োজনই প্রধান কর্তব্য, তাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের চিত্ত জয় সহজ হবে, অন্য পন্থায় তা করতে বহু সময় লাগবে বৈ কি। মহান আল্লাহ এই জন্যেই সূরা মাউনে বলেছেন, "তুমি কি দ্বীনের অস্বীকারকারীদের দেখেছ? তারা হচ্ছে সেই সকল মানুষ যারা এতিম (অসহায়-দুর্বল) -দের গলা ধাক্কা দিয়ে তাদেরকে অবজ্ঞা করে চলে আর অন্ন বস্ত্রহীন অভাবী- ক্ষুধাক্লিষ্টদের খাবার দানে উদ্যোগী হয় না বা অপরকে উদ্যোগী করে তোলেনা? ঐ সকল নামাজীর জন্যেও দুর্ভোগ যারা নিজেদের নামাজের (তাৎপর্য সম্পর্কে) গাফিল- উদাসীন । শুধু লোক দেখানোর জন্যেই তা করে এবং অপরকে প্রয়োজনীয় তুচ্ছ জিনিস দানেও নিষেধ করতে দ্বিধা করেনা।" তেমনি মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "সে ব্যক্তি খাটি মুমিন নয় যে নিজে পেট পুরে আহার করে আর তার প্রতিবেশী ক্ষুধায় মরে।"

সত্যি কথা বলতে কি, আল-কুরআনে উল্লেখিত মানব জীবনের অতীব জরুরী খাদ্য সমস্যার সমাধানের প্রতি আমাদের ধর্মীয় মহলের যেরূপ গুরুত্ব দেয়া জরুরী ছিল,সেরূপ এই গরীব দেশে দেয়া হয়নি কিংবা দেয়া হলেও কুরআনের পারলৌকিক বিষয়াদিকে যেরূপ অধিক প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, সেতুলনায় বহুত কমই দেয়া হয়েছে।

কায়েদের আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ও মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)

কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। দীর্ঘ দিনের আযাদী আন্দোলনের পটভূমিতে শেষ পর্যায়ে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তাঁরই নেতৃত্বে মনযিলে মাক্সুদে পৌঁছে। ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রবল বিরোধিতার মুখে অখণ্ড ভারতকে খণ্ড করে একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সফলতা বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছিল। বেশী অবাক করেছিল বস্তুবাদী সভ্যতার এই চোখ-ঝলসানো মুহূর্তে ধর্মের নামে, ইসলামের নামে শ্লোগান দিয়ে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি। এই বিস্ময়কর সফলতার মূলে কি রহস্য কাজ করেছিল, তার অনুসন্ধান করার দায়িত্ব ছিল তাঁর জীবনী লেখকদের উপর। সেই রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করা হলে আলেমদের আরেকটি বিরাট অবদানের তথ্য উদঘাটিত হত। মুলতানের জনাব আব্দুর রহমান খাঁ তাঁর লেখায় অবিভক্ত পাকিস্তান আন্দোলনের মূল প্রেরণা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মরহুম মওলানা আশরাফ আলী থানভীর "রুয়েদাদে তাবলীগ'এর উদ্ধৃতি দিয়ে যুক্তি প্রমাণ সহকারে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান নেতার চরিত্রে মওলানা থানভীর কি প্রভাব ছিল।

মওলানা থানভীর আত্মবিশ্বাস ছিল যে, পাকিস্তান আন্দোলন অবশ্যই সফলতায় পৌঁছুবে। তাই তিনি একে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং কোরআন-সুন্নাহ্র ভিত্তিতে এর সংবিধান গঠন করতে হলে এর নেতাদের সর্বপ্রথম ইসলামী হওয়ার বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, যেই কথার ভিত্তিতে ভারতের ন্যায় বিশাল দেশকে খণ্ড করা হচ্ছে, তা প্রতিষ্ঠিত না হলে, এত বড় পরিবর্তন ও এই উদ্দেশ্য বহু মুসলমানের রক্ত, ত্যাগ-তিতিক্ষা সব কিছুই বিফলে যাবে। এজন্য তিনি ইসলামী রাষ্ট্র হবার প্রথম শর্ত মুসলিম নেতাদের তাবলীগের মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা করেন। থানাভবনের সবচাইতে বিত্তবান ব্যক্তি থানভী দরবারের বিশিষ্ট দূত খানকা-এ এমদাদিয়ার পরিচালক ও মওলানা থানভীর ভ্রাতুষ্পুত্র জনাব শাব্বির আলীকে কাজে লাগান। শাব্বীরের লিখিত "রুয়েদাদে তাবলীগ"এর উদ্ধৃতিটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য-

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের কথা। একদিন দ্বিপ্রহরে খানা খেয়ে আমি অফিসে বসে কাজ করছি। হযরত থানভীও দুপুরের খানা খেয়ে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে খানকায় তাশরীফ

এনেছেন। বারান্দায় এসে আমাকে ডাক দিলেন। আমি দ্রুত হাযির হয়ে গেলাম এবং তাঁর সামনে বসে পড়লাম। হযরত থানভী মাথা নিচু করে কি যেন ভাবছিলেন। সে সময় ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। তবে কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাদের মনের গতি অনেকটা আঁচ করা গেছে। নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষ –সকলের মুখে একই কথা যে, হিন্দুদের মুসলিমবিদ্বেষী মনোভাবের দরুণ তাদের সাথে মুসলমানের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক কোনদিক থেকেই সহাবস্থান সম্ভব নয়।

সুতরাং আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র অবশ্যই গঠন করতে হবে। মওলানা থানভী দু'ই/তিন মিনিট পর মাথা তুললেন এবং আমাকে যেসব শব্দ বললেন আজও সেগুলো আমার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তা হলো এই–

"মিঞা শাব্বির আলী! বায়ুর গতিপ্রবাহ বলে দিচ্ছে, লীগই জয়যুক্ত হবে। তারাই শাসনক্ষমতার অধিকারী হবে, যাদেরকে আজ ফাসেক-ফাজের বলা হচ্ছে। .....এজন্যে আমাদের এই প্রচেষ্টা চালানো উচিত যেন এসব লোক (মুসলিম লীগ নেতাদের) কে সংশোধন করা যায়। বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতি হলো, আলেমদের হাতে ক্ষমতা আসলেও (আধুনিক রাজনীতিজ্ঞানসম্পন্ন আলেমের সংখ্যাল্পতা হেতু এ মুহূর্তে) তাদের রাষ্ট্র চালাতে বেগ পেতে হবে বৈ কি? ইউরোপের সঙ্গে কায়কারবার, আন্তর্জাতিক টানাহেঁচড়া, এই অবস্থায় ইংরেজী শিক্ষিত নেতাদের ছাড়া আলেমরা এককভাবে কিছু করতে পারবেন না। তোমাদের চেষ্টায় যদি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান নেতারা ধার্মিক হয়ে ওঠে, সেটাই বরং আমাদের আনন্দের কথা। তারা ইসলাম অনুযায়ী দেশ শাসন করলে তাদের হাতেই রাষ্ট্রীয় পরিচালনা-ভার থাকতে অসুবিধা নেই। আমরা তাতে বরং আনন্দিতই হবো। ইসলামের জন্যই ক্ষমতায় যাওয়া। তারা সে দায়িত্ব পালন করলে আমরা ক্ষমতার প্রত্যাশা করি না। আমরা এটাই চাই যে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক, দ্বীনদার খোদাভীরু নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা থাকুক, যেন দ্বীনের প্রাধান্যই সমাজ জীবনের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।"

আমি একথার জবাবে বললাম, তবে হযূর! এ তাবলীগ কি নিম্ন পর্যায় তথা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু হবে, না উপরস্থ নেতৃবৃন্দ থেকে? থানভী সাহেব বল্লেন, "উপর থেকে শুরু করতে হবে। কেননা সময় অতি কম। উপরন্তু নেতার সংখ্যাও ততবেশী নয়। আন্নাসু আলা দ্বীনে মুলুকিহিম "মানুষ সকল সময় নিজেদের রাষ্ট্রীয় নেতাদের রীতিনীতিরই অনুসরণ করে। নেতারা ধার্মিক হলে ইনশাআল্লাহ্ সাধারণ মানুষও সংশোধন হয়ে যাবে।" (–রুয়েদাদ পৃঃ ১,২)

তাবলীগী প্রতিনিধি দল গঠন

৪ঠা জুন, ১৯৩৮ খৃঃ। বোম্বেতে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। লীগ নেতাদের হেদায়াতের জন্য মওলানা থানভী উক্ত অধিবেশনে এক তাবলীগী প্রতিনিধি দল পাঠাতে মনস্থির করলেন। তিনি মওলানা শাব্বীর আহ্মদ ওসমানীকে এই প্রতিনিধি দলের নেতা নির্বাচন করলেন। মওলানা আবদুর রহমান গময়থালভী এবং ছাহারানপুরের অপর একজনকে প্রতিনিধি দলের সদস্য মনোনীত করেন। প্রতিনিধি দলের খরচ বাবত তিনি নিজ পকেট থেকে তিন'শ টাকা বের করে দিয়ে বললেনঃ মওলানা শাব্বীর আহ্মদ ট্রেনে সেকেণ্ড, ফার্স্ট যেই ক্লাসেই সফর করে, তাঁকে সেই ক্লাসের টিকেট কেটে দিও। তোমরা তৃতীয় অথবা ইন্টার ক্লাসের টিকেট কেটো। বোম্বেতে আরও টাকার দরকার পড়লে হাকীম আজমীরী সাহেব থেকে নিয়ে নিও এবং বোম্বেতে থাকতেই আমাকে চিঠি দিও যেন টাকা পাঠাতে পারি। ফিরে এসে বললে টাকা পৌছুতে বিলম্ব হবে। (-রুয়েদাদ, ২ পৃঃ)

মওলানা শওকত আলীকে পত্রদান

মওলানা থানভী (রহঃ) প্রতিনিধি দলের যাত্রা সম্পর্কে মওলানা শওকত আলীকে অবহিত করেন এবং ইউ পি-র মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভাপতি জনাব ইসমাঈল খাঁকেও এই মর্মে একটি পত্র লিখলেন। পত্রটির সারমর্ম এই-

"আস্সালামু আলাইকুম, আপনার পত্রখানা পেয়েছি । জেনে খুশি হলাম যে, আপনিও ঐ সম্মেলনে ওলামা প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। এ প্রতিনিধি দলের থাকার ব্যবস্থাকল্পে মওলানা শওকত আলীকেও পত্র লিখেছি। তাতে একথা জানিয়ে দিয়েছি যে, খাবার ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করবে।" সারকথা, ইনশাআল্লাহ তারা ৩রা জুন ভোরে এক্সপ্রেসে বোম্বে পৌছুবে। আশা করি, আপনি মিস্টার মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এবং অন্যান্য মুসলিম লীগ সদস্যের সঙ্গে আলাপ করে তাদের সাথে তাঁর আনুষ্ঠানিক আলোচনার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেবেন।"

-ওয়াস্সালাম
আশরাফ আলী
থানাভবন

প্রতিনিধি দলের প্রতি উপদেশ

লীগ নেতা জিন্নাহ্ সাহেবের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে মওলানা থানভী মওলানা শাব্বীর আলীকে যেই পরামর্শ দিয়ে পাঠান, তা হলো-

জিন্নাহ্ সাহেবের সঙ্গে যেসব বিষয় আলোচনা করা হবে আমি সেগুলো মওলানা শাব্বীর আহ্মদকে লিখে দিয়েছি। সেই দলের প্রতিনিধি। এ ছাড়া কথাবার্তাও গুছিয়ে বলার যোগ্যতা আছে, তবে তোমার কথা বলার প্রয়োজন হলে নরম সুরে বলবে। বিতর্কমূলক বিষয় অবশ্যই পরিহার করবে। শ্রোতা বিতর্কমূলক বিষয় আলোচনায় আনতে চেষ্টা করলেও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তা এড়িয়ে যাবে এবং অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করবে। শ্রোতার কোনো কাজের ব্যাপারে সমালোচনার দরকার হলে তা সমালোচনার সুরে না বলে তাবলীগ ও সহানুভূতির ভঙ্গিতে ব্যক্ত করবে। শব্দ মোলায়েম হলেও জবাব এমনভাবে দেবে যাতে শ্রোতা অনায়াসে বুঝে নিতে পারেন। যেমন একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি– একবার আমি ফতেহপুর হতে এলাহাবাদ যাচ্ছিলাম। ট্রেনে কয়েকজন আলীগড়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকও সফর করছিল। তারা আমাকে জানতো না। মৌলভী আকৃতির দেখে জিজ্ঞেস করলো, "মওলানা! কুকুর পালা শরীয়তে নিষেধ কেন? অথচ এর মধ্যে অনেক ভাল গুণওতো রয়েছে।" জাতীয় সহমর্মিতা ও সহানুভূতির জন্য আলীগড়ের তখন খ্যাতি। ঐ সময় আমি তাদের নিকট শরীয়তের মাসয়ালা ও আল্লাহ-রসূলের হুকুম-আহ্কাম বর্ণনা করলে আলোচনা দীর্ঘায়ীত হয়ে যাবে। এদিকে তাদের অন্তরে কুকুর পালার অপকারিতার প্রতি ঘৃণার ভাব সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্যও হাসিল হবে না। তাই বল্লাম ঃ কুকুরের অন্যান্যগুণ আছে ঠিকই, কিন্তু এর এমন একটি দোষ রয়েছে যা সকল গুণকে বিনষ্ট করে দেয়। তারা ঔৎসুক্য নিয়ে জিজ্ঞাস করলো, তবে সেই দোষটি কি? আমি বললাম, এতে স্বজাতীয় সহানুভূতি নাই। নিজ সম্প্রদায়ের অন্য একটিকে দেখামাত্রই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। জবাবে যুবকদল অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বলল, সত্যই এ জীব কাছে রাখার অনুপযোগী। এতে নিজের মধ্যেও এর প্রভাব দেখা দেবে। –কাজেই নেতাদের সঙ্গে আলোচনাকালে লক্ষ্য রাখবে যাতে মূল উদ্দেশ্য হাতছাড়া না হয়। তবে কথা বলার সময় শ্রোতার জ্ঞানের দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। (–রুয়েদাদ, ৩ পৃষ্ঠা)

এ নির্দেশ নিয়ে মওলানা শাব্বীর আলী ১লা জুন (১৯৩৮ খৃঃ) প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যের সাথে মওলানা শাব্বীর আহ্মদ ওসমানীর নিকট পৌছেন, যিনি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করবেন। তাঁর নিকট মওলানা থানভীর চিঠি দেয়া হলো। কিন্তু অকস্মাৎ মওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানীর মাতা গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় তিনি বোম্বে যেতে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ

পুনরায় থানাভবন এসে মওলানা থানভীর কাছে সকল ঘটনা খুলে বললেন। এতে তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করলেন। অতঃপর "যা হয়েছে ভালর জন্যই হয়েছে" বলে নবাব মুহাম্মদ ইসমাঈল খাঁকে তিনি পুনরায় চিঠি লিখলেন যে, উল্লেখিত কারণে প্রতিনিধি দলের বোম্বে যাওয়া অনিশ্চিয়তার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। পরে বিস্তারিত জানাবো। মওলানা থানভী প্রতিনিধি দলের উপযুক্ত নেতৃত্বদানের লোক না পেয়ে ঐবারের মতো বিষয়টি মুলতবী রেখে দিলেও ঐ সালের (১৯৩৮ খৃঃ) ডিসেম্বর মাসে তিনি পাটনায় মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে তাবলীগি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছিলেন। বিশিষ্ট মুসলিম নেতারা ঐ অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। এবারকার প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন -মওলানা জাফর আহ্‌মদ ওসমানী, মওলানা আবদুল জাব্বার আবুহ্‌বী, মওলানা আবদুল গণী ফুলপুরী এবং মওলানা মুয়ায্‌যম হোসাইন। মওলানা মুরতাজা হাসানকে প্রতিনিধি দলের নেতা নির্বাচন করা হয়। প্রয়োজনীয় খরচের টাকা মওলানা নিজের পকেট থেকে বের করে মওলানা শাব্বীর আলীর হাতে দিলেন এবং পাটনায় গিয়ে তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য উকিল আবদুর রহমানের বাসায় অবস্থানের জন্য বলে দিলেন। মওলানা থানভী পূর্বাহ্নেই আবদুর রহমান কে এ ব্যাপারে চিঠি দিয়ে রেখেছিলেন। ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৩৮ খৃঃ) প্রতিনিধি দল পাটনায় পৌছুল। কায়েদে আযমের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে রুয়েদাদ মওলানা শাব্বীর আলী লেখেন-

"আমাদের কোন কোন সঙ্গী মুসলিম লীগ অধিবেশনে শরীক হতে চাইলেন। আমি নিষেধ করলাম। কারণ আমরা মওলানা থানভীর পক্ষ থেকে প্রেরিত। জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে আলোচনার আগ পর্যন্ত আমরা অধিবেশনে শরীক হতে পারি না- আমরা দেখবো, তিনি কি জবাব দেন। আমি এখনই নবাবযাদা লেয়াকত আলী খানের নিকট যাচ্ছি। তাঁর মাধ্যমে আলোচনার সময় নির্ধারণ করে আসবো। আমি চলে গেলাম। লিয়াকত আলী খান জিন্নাহ সাহেবকে জানালেন। জিন্নাহ সাহেব বিকেল ৫টায় আলোচনার সময় রাখলেন। ফিরে এসে প্রতিনিধি দলের নেতা মওলানা মুরতাযা হাসান সাহেবকে জানালাম।

বিকেল সাড়ে চারটায় আমরা বাসা থেকে বের হলাম। ঠিক ৫টার সময় জিন্নাহ সাহেবকে আমাদের আগমনের খবর দিলাম।

কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে প্রতিনিধি দলের প্রথম সাক্ষাতকার

"উপরে উঠলাম। জিন্নাহ সাহেব কুরসীতে বসা। আমাদের দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। সকলের সঙ্গে মোসাফাহা করলেন। জিন্নাহ সাহেব অধিবেশন উপলক্ষে যাঁর বাড়ীতে অতিথি হয়েছেন, তিনি হলেন ব্যারিষ্টার আবদুল আযিয। তিনি আমাদের সকলকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আলোচনা শুরু হলো। প্রায় এক ঘন্টা কাল আলোচনা স্থায়ী ছিল। জিন্নাহ সাহেব এমন সন্তোষজনক উত্তর দিলেন যে, তাঁর প্রতিটি উত্তরে আমরা সকলে বিশেষ করে আমি অত্যধিক প্রভাবিত হলাম।

কারণ আলোচনা চলাকালে তাঁর কোনো কথা-কাজের অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি কোনরূপ ব্যাখ্যা বা কারণ প্রদর্শন ছাড়াই নিজের ত্রুটি স্বীকার করে নিতেন এবং ভবিষ্যতে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিতেন। আমাদের বলতেন- "আপনারাও আমার জন্য দোয়া করবেন যেন নিজেকে সংশোধন করতে পারি।" জিন্নাহ সাহেবের মত ব্যক্তিত্বকে আমরা কি সংশোধন করবো? -এটা বরং মওলানা থানভীর ন্যায় আল্লাহর খাস বান্দার আধ্যাত্মিক আকর্ষণেরই ফল যে, জিন্নাহ সাহেব আমাদের সাক্ষাতে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছেন। অথচ এটা প্রায় সকলেরই জানা কথা যে, অনেক বড় বড় ব্যক্তির কথায়ও জিন্নাহ সাহেব সহজে প্রভাবিত হওয়ার পাত্র ছিলেন না।"

জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে নামাজের আলোচনা

একবার এক ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক ধর্মীয় বিষয়ও তাঁর সাথে আলোচিত হয়। তন্মধ্যে একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা কায়েদে আযমের চরিত্র ও চিন্তাধারায় বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। মওলানা শাব্বীর আলী সাহেব জিন্নাহ সাহেবের সাথে প্রথম সাক্ষাতকারের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন-

টীকাঃ (১) কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মওলানা আযাদ সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন, সম্ভবতঃ আযাদের রচনাবলী, তাঁর চিন্তাধারা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সম্যক অবগতির জন্যে যেসব বিষয় এবং যেই প্রচুর সময় ও মনমানসিকতার দরকার ছিল, জিন্নাহ সাহেবের পক্ষে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি বলেই এরূপ মন্তব্য করে বসেছেন। উভয়ের রাজনৈতিক মতদ্বৈধতা জনিত সাময়িক উত্তেজনাও এরূপ মন্তব্যে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে বৈ কি। অন্যথায়, এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও চিন্তানায়ক পরলোকগত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নেহরু অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে মওলানা আযাদ প্রসঙ্গে "মেরা সিয়াসী উস্তাদ-আমার রাজনৈতিক গুরু" বলে তাঁকে উল্লেখ করতেন।

"আলোচনার এক পর্যায়ে আমি জিন্নাহ সাহেবকে প্রশ্ন করলাম যে, আপনি হাজার হাজার টাকা ব্যয়ে সভার প্যান্ডেল ইত্যাদি তৈরী করেন। জনতা গলা ফাটিয়ে 'নারায়ে তাকবীর' শ্লোগান দেয়। তাতে লাভ কি? জিন্নাহ সাহেব বল্লেন, "এতে বিধর্মীদের উপর প্রভাব পড়ে।" আমি বল্লাম, এজন্যে অন্য একটি প্রস্তাব দিতে পারি কি, যাতে আরও অধিক প্রভাব পড়বে? তিনি বল্লেন, তা কেমন? বল্লাম, সভা চলাকালীন যদি নামাজের সময় এসে যায়, তখন এক লাখ/দেড় লাখ লোক নিয়ে জামায়াতে নামাজ আদায় করা। তাতে দেখবেন মানুষের উপর এর কিরূপ প্রভাব পড়ে। জিন্নাহ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বল্লেন, আপনি তা ঠিকই বলেছেন, কিন্তু এ মুহূর্তে আমি তা করতে অপারগ।" অতপর আমি কারণ জানতে চাইলে তিনি বল্লেন, "আপনি জামাতে নামাজ আদায় করার কথা বলছেন। ইমাম কাকে করবো? সকলে না হোক, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক আমার পেছনে নামাজ পড়বে না। এছাড়া আমি ইমামতের যোগ্যও নই। আমার মধ্যে এর যোগ্যতাও নেই। এজন্যে অপরকে ইমাম বানাতে হবে। ফলে ইমাম দেওবন্দী হলে ব্রেলভী তাঁর পেছনে নামাজ পড়বে না, আর ব্রেলভী হলে দেওবন্দী নামাজ পড়বে না তাঁর পেছনে। আলাদাভাবে নামাজ পড়লেও প্রভাবের পরিবর্তে বিজাতীয়ের কাছে মুসলমানদের মতবিরোধ নগ্ন হয়ে ফুটে উঠবে। এখন প্রত্যেকে নিজ নিজ মসজিদে নামাজ পড়ে আসে। একাধিক দল কয়েক জায়গায় নামাজ পড়লে এতেও প্রভাব বেশী বই কম পড়বে না। এ কারণে বর্তমান পরিস্থিতিতে তা করতে অসুবিধা বৈ কি?। তবে ভবিষ্যতে দেখা যাবে।"

আমি বল্লাম, এই অজুহাত যথার্থ কিনা সে বিষয়ে আলাপ করতে গেলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে। সে সম্পর্কে অন্যসময় আলোচনা করবো। এখন আর একটি কথা আরয করছি। খোদ্ আপনার উপরওতো নামাজ ফরয–পড়েন না কেন? আপনি সভা-সমিতিতে যখন নামাজের সময় হয় জায়নামাজ বিছিয়ে নিয়ত বেঁধে নিন– তাতে অপর কেউ পড়ুক বা না পড়ুক।"

এ পর্যন্ত আমি জিন্নাহ সাহেবের কথা নকল করলাম। ভাষা আমার– বক্তব্য তাঁর। সামনে উপরোল্লিখিত প্রশ্নের যে জবাব জিন্নাহ্ সাহেব দিয়েছেন, সে সকল শব্দের ধ্বনি আজও আমার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ঐ জবাবটি শুনে আমি ঘর্মাক্ত হয়ে গেলাম। একজন বেআমল অথচ বিরাট ব্যক্তিত্বের পক্ষে এভাবে সবার সামনে নিজের ত্রুটি স্বীকার অত্যন্ত বড়কথা। আমাদের মতো লোক এরূপ প্রশ্নের সম্মুখীন হলে হয়তো অন্য কোনো ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতাম। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন। তিনি কুরসীতে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমার কথা শুনে সম্মুখে ঝুঁকে আসলেন এবং নেহায়েত অনুশোচনার সুরে নিম্নের কথাগুলো বল্লেন ঃ

"আমি গুনাহ্গার-অপরাধী। আপনাদের অধিকার আছে আমাকে বলার। এসব কথা শোনা আমার কর্তব্য। আমি আপনাদের সঙ্গে ওয়াদা করছি ভবিষ্যতে নামাজ পড়বো।" আমরা প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ছাড়াও সেখানে অন্য বার/তের জন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মেধ্যে ছাহারানপুরের উকীল মৌলভী মনফাত আলী সাহেব, পাটনার উকীল মৌলভী আবদুল রহমান সাহেব এবং পাটনার ব্যারিষ্টার জনাব আবদুল আযীয সাহেবই শুধু আমার পরিচিত ছিলেন। তাঁদের সামনে কোনোরূপ ব্যাখ্যার আশ্রয় না নিয়ে এরূপ ভাষায় অকপটে নিজের ত্রুটি স্বীকার এবং ভবিষ্যতে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি আমাকে দারুনভাবে প্রভাবিত করে। এ অবস্থায় নিজেকে সামলে নিয়ে চট্ করে আমি বল্লাম–দেখুন, এটা জিন্নাহ সাহেবের ওয়াদা-কোনো পথ চলা লোকের ওয়াদা নয়। এ ওয়াদা অবশ্যই পূরণ হবে। এ কথায় জিন্নাহ্ সাহেব সোজা হয়ে বসলেন এবং বার বার বুকে হাত মেরে বলতে লাগলেন ঃ– জিন্নাহর ওয়াদা, জিন্নাহর ওয়াদা, আমি এই ওয়াদা পালনের চেষ্টা করবো। আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন।"– (মুশাহাদাত ও ওয়ারেদাত, ১১৪–১১৮ পৃঃ)

মুসলিম লীগ অধিবেশনে মওলানা থানভীর লিখিত ভাষণ পাঠ

"জিন্নাহ্ সাহেবের সঙ্গে প্রতিনিধি দলের সাক্ষাতের পর মুসলিম লীগের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে আমি মওলানা থানভীর প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করি। এই অধিবেশনে থানভীর লিখিত ভাষণ পাঠ করে শুনান হয় এবং সকলের মধ্যে এর ছাপানো বুকলেট বিলি করা হয়। এ পুস্তিকায় লীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদেরকে নামায, রোযাসহ ইসলামী কৃষ্টি-সংস্কৃতির পূর্ণ অনুসারী হবার আহবান জানানো হয়। তার পূর্বদিন প্রতিনিধি দল থানভী সাহেবের নিকট তাদের প্রথম সফলতার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি তাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং জিন্নাহ্ সাহেবও তাঁর লক্ষ্য অর্জিত হবার জন্য দোয়া কারেন।"

কায়েদে আযমের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা সাক্ষাত

এরপর থেকেই থানভী সাহেব কায়েদে আযমের কথা ও কাজের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য রাখতেন। তাঁর মধ্যে শরীয়ত বিরোধী কোনো কিছু দেখা মাত্রই তিনি প্রতিনিধির মাধ্যমে তাঁর কাছে লিখে পাঠাতেন। ১৯৩৮ সালের আগষ্টের পর

কায়েদে আযম যেসব বক্তৃতা দিয়েছেন এগুলোর মধ্য দিয়ে তাঁর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তিনিও পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষদের ন্যায় ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা জ্ঞান করতেন এবং একটিকে আরেকটি থেকে আলাদা করতে চেয়েছিলেন। এতে মওলানা থানভী শাব্বীর আলী সাহেবকে ডেকে বললেনঃ

"জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতা-বিবৃতিতে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা মনে করছেন। এ ব্যাপারে তুমি তাঁকে বুঝাবে।" -(কুয়েদাদ-এ-তাবলীগ, ৬ পৃঃ)

মওলানা শাব্বীর আলী সাহেব এজন্যে ঝটপট তৈরী হয়ে গেলেন। তাঁর অনুরোধে থানভী সাহেব এবার তার সহকারী দিলেন মওলানা জা'ফর আহমদ উসমানী ও মুফতী-এ আযম মওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেবকে। তিন সদস্য বিশিষ্ট এই প্রতিনিধি দলটি ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ খৃঃ দিল্লী পৌছেন। মওলানা শাব্বীর আলী কায়েদে আযমকে টেলিফোনে নিজের পরিচয় পেশ করলেন। -"আমি সেই ব্যক্তি যে একবার পাটনায় আপনার সাক্ষাত লাভ করেছিলাম। আমাকে কিছু সময় দিতে মর্জী করবেন।" কায়েদে আযম তাঁকে সন্ধ্যা ৭টায় সময় দিলেন। প্রতিনিধি দল যথাসময় উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন।

ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা

ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞানের আদান-প্রদান চলল। মওলানা জা'ফর আহ্মদ উসমানী কায়েদে আযমকে বল্লেনঃ

"মুসলমান কোন আন্দোলনে ততক্ষণ পর্যন্ত সফলতা লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ঐ আন্দোলনের নেতারা নিজেরা ইসলামী বিধানের অনুসারী হবেন এবং তাদের কর্মীরা ইসলামী কৃষ্টি-সংস্কৃতি মেনে চলে। তাঁরা নিজেদেরকে ধর্মীয় বিধানের অনুসারী করলে ইন্‌শাআল্লাহ্ তার বরকতেই আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে ও সফলতা তাঁদের পদচুম্বন করবে। প্রতিনিধি দল বললেন, -"মুসলমানদের রাজনীতি কখনও ধর্ম থেকে আলাদা নয়। মুসলিম জাতির মহান নেতৃবৃন্দ একই সময় মসজিদের ইমাম ছিলেন আবার রণাঙ্গনেও সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীন, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ), হযরত আবু ওবায়দা ইবনুলজার্রাহ, হযরত আমর ইবনুল আ'স প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ যুগপৎ ধর্ম ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের অনুশীলনকারী ছিলেন।" কায়েদে আযম বল্লেন-আমারতো

ধারণা এই যে, ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা রাখা উচিৎ। প্রতিনিধি দল বললেন ঃ –তাহলে এভাবে কিছুতেই সফলতার আশা করা যায় না। এ ব্যাপারে জিন্নাহ্ সাহেবের সঙ্গে আড়াই ঘন্টা আলোচনা চলে। তারপর প্রতিনিধি দলের আলেমগণ বিশ্বের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সফলকাম.রাজনীতিককে ধর্মের সীমায় আনতে সক্ষম হন। কায়েদে আযম প্রতিনিধি দলের উপস্থাপিত বক্তব্যসমূহ স্বীকার করে নিয়ে নিজের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন ঃ–

"বিশ্বের অন্য কোন ধর্ম রাজনীতি থেকে আলাদা থাক বা না থাক, আমার নিকট এটা সুস্পষ্ট যে, ইসলামের রাজনীতি ধর্ম থেকে আলাদা নয়। বরং এখানে রাজনীতি ধর্মের অনুগত।" –(রুয়েদাদ, ৭ পৃঃ)

তাবলীগী সাক্ষাতকারের ধারাবাহিকতা

এভাবে থানভী দরবার ও কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাতকার পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। যখনই কোনো ব্যাপারে ধর্মীয় দিক থেকে মওলানা থানভী কায়েদে আযমকে কিছু বলার প্রয়োজন মনে করতেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন। পরবর্তী পর্যায়ে মওলানা শাব্বীর আলীই কেবল প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করতেন। তবে মওলানা শাব্বীর আলীকে জিন্নাহ্ সাহেবের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনার অনুমতি থানভী দেননি। কারণ, জিন্নাহ্ সাহেব নিজেই এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মধ্যে অভাব ছিল শুধু ইসলামী জ্ঞানের। তাই জিন্নাহ্ সাহেবের সঙ্গে মাওলানা শাব্বীর আলী যতবারই সাক্ষাত করেছেন প্রত্যেকবার ধর্মীয় বিষয়ই ছিল আলোচ্য বিষয়। রাজনৈতিক কোনো আলোচনা হয়নি। যেমন রুয়েদাদে মওলানা শাব্বীর আলী উল্লেখ করেছেন–

একবার থানভী সাহেবের নির্দেশক্রমে আমি কায়েদে আযমের নিকট উপস্থিত হলাম। সময় ঐ সন্ধ্যা সাতটা। এখনও পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, এমন সময় বাইরে গাড়ীর হর্ণ শুনা গেল। দারওয়ান এসে বলল, ডক্টর জিয়াউদ্দীন সাহেব এসেছেন। আমি তো ভেবেছি আজকের আলোচনা বোধ হয় এ পর্যন্তই শেষ -আর এক দিনের প্রোগ্রাম করতে হবে। কিন্তু জিন্নাহ্ সাহেব ক্ষণিক ইতস্তত করে দারওয়ানকে বল্লেনঃ ডক্টর সাহেবকে বসিয়ে দাও। অতঃপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হ্যাঁ জী বলুন। আমি আমার বক্তব্য পেশ করতে লাগলাম। জিন্নাহ সাহেবও আলোচনা করতে লাগলেন। এটা হযরত থানভীরই বরকত যে, আমার মতো পুঁজিশূন্য ব্যক্তি আলোচনার মধ্য দিয়ে জিন্নাহ সাহেবের মতো ব্যক্তিত্বের সামনে যুক্তিপূর্ণভাবে বক্তব্য পেশ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এই আলোচনা বৈঠকও

কায়েদে আযমের এই বাক্যটির মধ্যদিয়ে সমাপ্ত হয়েছিল যে, –"হ্যাঁ, আমার ভুল ছিল। এখন বুঝে এসেছে।"

রাত দশটায় আলোচনা বৈঠক সমাপ্ত হয়। আমি অনুমতি নিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, সর্বদাই আপনার সময় ব্যয় করি, আজ কিন্তু আমার কারণে ডক্টর সাহেবের বেশী কষ্ট হয়েছে। এতে কায়েদে আযম বল্লেনঃ "না, না। আপনি কখনও এটা মনে করবেন না। ডক্টর সাহেবের সঙ্গে সব সময়ই কথা হয়। এখনও তিনি কেন এসেছেন আমি জানি। কিন্তু আপনি তো মাঝে-মধ্যে আসেন এবং হযরত থানভীর কথাই আমাকে বুঝান। আমার নিকট অনেক আলেমই আসেন, কিন্তু তাঁরা অভিজ্ঞ নন। আমি ধর্মের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। হযরত থানভী আপনাকে একবারও কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে কথা বলার জন্য পাঠাননি। আপনার দ্বারা আমার খাস্ ধর্মীয় ব্যাপারে জ্ঞান লাভ হচ্ছে, যা অপর কোথাও ভাগ্যে জুটছে না। আপনি যদি আরও কিছু বলতে চান, বসুন–আমার কোনো তাড়াহুড়া নেই। আমি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শুনবো।"

আমি বললাম, অদ্য আমার যা বক্তব্য ছিল বলে ফেলেছি। ধর্মীয় ব্যাপারে আপনার এই আগ্রহ আল্লাহ্ আরও বৃদ্ধি করুন। হযরত থানভী আবার হুকুম করলে আপনার দরবারে হাযির হবো। "আচ্ছা আপনার মর্জী" –জিন্নাহ্ সাহেব বললেন। আমি ঐ দিনকার মত চলে এলাম। (রুয়েদাদ, ৮, ৯ পৃঃ)

মওলানা থানভীর প্রতি জিন্নাহ্ সাহেবের আস্থা

হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেবের প্রতিনিধি শাব্বীর আলী সাহেবের সঙ্গে কায়েদে আযমের অকপটে কথাবার্তা চলতো। কোন কোন সময় উভয়ের সূক্ষ্মানুভূতি বিনিময়েরও পরিবেশ সৃষ্টি হতো। যেমন শাব্বীর আলী সাহেব লিখছেনঃ

"একবার আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বললামঃ জিন্নাহ সাহেব! আমরা ইংরেজী রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ, এজন্যে সে ব্যাপারে আপনার "তকলীদ" (অনুসরণ) করি। আপনি ইংরেজকে থাপ্পর মারতে বললে আমরা থাপ্পর মারি। আপনি ঘুষি মারতে বল্লে আমরা ঘুষি মারি। মোটকথা, আপনি যা বলেন এ ব্যাপারে আমরা আপনার অনুসরণ করি। আমরা (আধুনিক) রাজনীতির ব্যাপারে যে পরিমাণ অনভিজ্ঞ আপনি ধর্মের ব্যাপারে তার চাইতে বেশী বা সে পরিমাণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং আমরা যেভাবে আপনার "তকলীদ" করি, আপনারও ধর্মীয় ব্যাপারে আমাদের তকলীদ করা উচিত। তার জবাবে জিন্নাহ্ সাহেব প্রশ্ন করলেন, "বর্তমানে পৃথিবীতে নেতার সংখ্যা কত? আমি বললাম, বর্ষাকালে ব্যাঙের সংখ্যা যত থাকে। এতে কায়েদে

আযম বেশ হাসলেন এবং বললেনঃ ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন ঃ "আপনারা কি প্রত্যেক নেতাকেই মানেন?" আমি বললামঃ না।" মানার জন্য কারুর প্রতি আস্থা থাকা শর্ত।" তিনি বললেনঃ

"বস্, আপনার যদি এটাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে, আমি বিনা দ্বিধায় আপনার কথা মেনে নেই, তাহলে আমি প্রস্তুত আছি। এযাবত তো বুঝার জন্যে আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতাম; কিন্তু আজ থেকে চুপচাপ বসে শুনবো। ধর্মীয় ব্যাপারে আপনি যেই নির্দেশ দেবেন, তা মেনে নেবো। কারণ, মওলানা থানভীর প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর স্থান অনেক উর্ধে এবং তাঁর মতসমূহ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে।"

আমি বললাম, "আল্লাহ্ আপনাকে প্রতিদান দিন। হযরত থানভীর মতামত গৃহীত হোক এটাই আমি চাই। তবে তর্ক অবশ্যই আপনি করবেন। এভাবে কথা বুঝে নিলে হৃদয়ে তা স্থায়ীভাবে রেখাপাত করে। তবে হতে পারে, আমার ত্রুটির ফলে কোনো সময় কথা বুঝাতে আমি ব্যর্থ হবো। আপনাকে কিন্তু তা মেনে নিতে হবে।" –একথা শুনে জিন্নাহ্ সাহেব হেসে উঠে বললেনঃ "অবশ্য অবশ্যই।" –(রুয়েদাদ–৯, ১০ পৃঃ)

কায়েদে আযমের নিকট থানভী সাহেবের চিঠি

তাবলীগী প্রতিনিধি দল প্রেরণ ছাড়াও মওলানা থানভী সাহেব কখনও কখনও সরাসরি জিন্নাহ্ সাহেবের সঙ্গে পত্র-বিনিময় করতেন। যেমন একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন–

......"আমি বরাবর মুসলিম লীগকে সংশোধনের চেষ্টা চালিয়ে আসছি এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নামে চিঠিপত্র ও সাধারণ পুস্তিকা প্রেরণ করে আসছি। সম্প্রতি পাটনায় অনুষ্ঠিত লীগ সম্মেলনে আমার কতিপয় প্রিয়জন ও বন্ধুবান্ধবের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছি। তারপর ১৯৩৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে একই উদ্দেশ্যে দিল্লী প্রেরণ করেছি। মোটকথা, আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব আমি লীগ নেতাদের মধ্যে দ্বীনের তাবলীগ করে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে অন্যরাও এ ব্যাপারে জোর দিলে এবং নামায, রোযা ও অন্যান্য ইসলামী রীতিনীতি ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি অনুসরণের ব্যাপারে তাদের প্রতি চাপ প্রয়োগ করলে মুসলিম লীগ খাঁটি মুসলিম লীগে পরিণত হতো।" –(ইফাদাতে আশরাফিয়া দর মাসায়েলে সিয়াসিয়া, ৮৬ পৃঃ)

একই পুস্তকের ৯৬ পৃষ্ঠায় হযরত থানভীর আর একটি বক্তব্য হলো এই যে– "যে সময় মুসলিম লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের বুঝাপড়া চলছিল, আমি তখন মুসলিম লীগ নেতা মিষ্টার জিন্নাহকে এ ব্যাপারে লিখলাম যে, পারস্পরিক আলোচনায়

মুসলমানদের ধর্মীয় স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই শরীয়ত সংক্রান্ত প্রসঙ্গে প্রথমে আপনি কোনো দখল না দিয়ে বিচক্ষণ আলেমদের সঙ্গে পরামর্শ করে সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করবেন।" তিনি অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জিত ভাষায় তার জবাব দিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করলেন যে, এই অনুসারেই কাজ করা হবে।"

কায়েদে আযম যেহেতু শান্ত-প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং হযরত থানভীর তাবলীগে অনেক প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন, তাই থানভী সাহেবের উপদেশাবলী তিনি সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতেন। একবার মওলানা জা'ফর আহমদ ওসমানীর উপস্থিতিতে থানভী দরবারে কায়েদে আযমের লেখা একটি ইংরেজী চিঠি আসে। তাতে লেখা ছিল-

"আপনার মোবারক চিঠি পেলাম। অত্যন্ত সুখী হলাম। শুকরিয়া আদায় করছি। আপনার উপদেশাবলী অনুসারে কাজ করার চেষ্টা করবো। ভবিষ্যতেও আপনি আমাকে এভাবে উপদেশ দিতে থাকবেন।"

হযরত থানভী সাহেব উর্দুতেই চিঠি লিখতেন। কিন্তু আযীযুল হাসান সাহেব মজযূব (থানভীর শিষ্য) ওইগুলো ইংরেজীতে অনুবাদ করে মূল চিঠির সঙ্গে জিন্নাহ সাহেবের নিকট পাঠাতেন যেন তাঁর বুঝতে সুবিধে হয়। এ জাতীয় সকল চিঠিপত্রের রেকর্ড মওলানা শাব্বীর আলী সাহেবের নিকট রক্ষিত থাকতো।

কায়েদে আযমের ফাইল

হযরত মওলানা থানভীর ইন্তেকালের পর বোম্বে থেকে পাঁচজন লোক থানাভবন এসেছিলেন। তাঁরা বোম্বের "দাওয়াতুল হক" সংস্থার সদস্য ছিলেন। এ সংস্থাটি মুসলিম-লীগ নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে তাবলীগী কাজ করার জন্য মওলানা থানভীর আহ্বানে গঠিত হয়েছিল। তাঁরা উল্লেখ করেন-

"আমরা একবার তাবলীগী প্রতিনিধি দল হিসাবে কায়েদে আযমের সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলাম। আলোচনার মাঝখানে তিনি বেশ প্রেরণা নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- "আচ্ছা বলুন তো, নিকট অতীতে হিন্দুস্থানে কোন্ বড় আলেম অতীত হয়ে গেছেন? আমাদের পাঁচ জনের মনেই হযরত থানবীর কথা ছিল। কিন্তু ভাবলাম হয়ত তাঁর দৃষ্টিতে অন্য কেউ হবেন। তাই আমরা কায়েদে আযমকে জিজ্ঞেস করলাম- আপনিই দয়া করে বলুন। সঙ্গে সঙ্গে কায়েদে অযম অপর একটি কক্ষে গেলেন এবং একটি ফাইল এনে খুলে দেখালেন। আপনারা বলতে পারেন কি এ লেখা কার? আমরা সকলেই হযরত থানভীর লেখা ধরে ফেললাম। বললাম, এতো হযরত থানভীর লেখা। এতে কায়েদে আযম উত্তেজনা সহকারে বললেন, হ্যাঁ, ইনিই এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম গুযরে গেছেন। তিনি হযরত থানভীর ভূঁয়সী প্রশংসা করলেন।

মিরাঠ জেলার সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি, ইউ, পি আইন পরিষদের সদস্য নবাব জামশেদ আলী খাঁ মওলানা থানভীর বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। থানভীর প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। নবাব সাহেবের সাধুতা ও আন্তরিকতায় কায়েদে.আযম অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁকে পরম বন্ধু মনে করে মাঝে-মধ্যে স্নেহের বোন ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে নিয়ে জামশেদ খানের বাড়ী বেড়াতে যেতেন। নবাব সাহেবের বাড়ীতে প্রায়ই থানভী সাহেবের কথা উঠতো। নবাব সাহেবের মুখে থানভী সাহেবের বিভিন্ন উপদেশাবলী কায়েদে আযম অত্যন্ত মনযোগ সহকারে শুনতেন। এতে পরোক্ষভাবে থানভী সাহেবের প্রতি জিন্নাহ্ সাহেবের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা অধিক বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৫৫ সালের ৪ঠা এপ্রিলে লিখিত নবাব জামশেদ সাহেবের একটি চিঠি এ ব্যাপারে লক্ষ্যণীয়।

"এটা সম্পূর্ণ বাস্তব সত্য যে, কায়েদে আযমের সকল ধর্মীয় সংশোধনে একমাত্র হযরত থানভীরই অবদান ছিল। তাঁর ইসলামী জ্ঞান থানভী সাহেবের দ্বারাই হয়েছিল। মওলানা শাব্বীর আলী কায়েদে আযমকে থানভীর নিকটতর করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন।"

একবার কায়েদে আযমের নির্দেশে ইউ, পি, মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্য ব্যারিষ্টার নবাব ইসমাঈল খাঁ সাহেব থানভী সাহেবের দরবারে আসেন এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করেছিলেন। হযরত থানভী ধীরস্থিরভাবে তাঁর প্রত্যেকটি কথা শুনলেন এবং একেক প্রশ্নের সুষ্ঠু জবাব দিলেন। ইসমাঈল খাঁ সাহেব হতবাক হয়ে গেলেন এবং পরে বললেনঃ

"আমি জানতাম না, খান্‌কাহ্‌নশীন, চাটাইতে বসা নীরব জীবন যাপনকারী হওয়া সত্ত্বেও কি করে তিনি রাজনীতিতে এত বিচক্ষণতার অধিকারী হলেন!"

থানাভবন পৌছার জন্য কায়েদে আযমের ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যস্ততায় ও অন্যান্য কতিপয় কারণে তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। কায়েদে আযম অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে থানভী সাহেবের নাম উচ্চারণ করতেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে কায়েদে আযমের চরিত্রে, পোশাকে-আশাকে যেই ধর্মীয় রূপ প্রাধান্য লাভ করেছিল, এটা মওলানা থানভীর প্রভাবেরই ফল ছিল।

থানভীর জনৈক ভক্ত ও কায়েদে আযম

জ্ঞানবানদের জীবনের মোড় দু'একটি জ্ঞানগর্ভ কথাতেই অনেক সময় ঘুরে যায়। লীগ নেতার চরিত্রে নবাব জামশেদ সাহেবের ভৃত্য হাজী-বন্ধু এক খাদাভীরু ব্যক্তি ছিলেন। সেও থানভীর ভক্ত। একবার কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ তাঁর সহোদরা ফাতেমা জিন্নাহ্‌সহ নবাব সাহেবের বাড়ীতে অতিথি হয়ে আসলেন। চারদিন তারা অবস্থান করছিলেন। হাজী বন্ধু তাঁদের যথেষ্ট খেদমত

করেন। হাজী বন্ধু থানভীর কাছে লিখিত এক পত্রে বলেন, "যাবার সময় জিন্নাহ্ সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, "খোদা আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন। তোমার ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু দিতে চাই।" আমি বললামমওলানা থানভীর প্রভাব বিস্তারের যে কয়টি বিষয় উপরে উল্লেখিত হয়েছে, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর একটি ক্ষুদ্র ঘটনা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এ ঘটনাটিও তাঁকে অধিক প্রভাবিত করেছিল।

থানভীর শিষ্য , "আপনি শুধু মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ হলে আপনার দান গ্রহণ করতাম; কিন্তু আপনি যে আমাদের কায়েদে আযম। তাই গোস্তাখী মাফ করবেন; আমার মন চায়, নিজের কায়েদে আযমকে বরং কিছু হাদিয়া পেশ করি, কিন্তু আমার সেই তওফীক কোথায়?" –ভ্রাতা ভগ্নি উভয়ই নিচের দিকে তাকিয়ে আমার কথা শুনছিলেন। আমি আরও বললাম, "ইন্‌শাআল্লাহ্ 'হযরতজীর' কাছে আমি আপনার প্রশংসা করবো।" –জিন্নাহ্ সাহেব সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন– "হযরতজী! মওলানা থানভী সাহেব?" আমি বললাম, "জী হ্যাঁ।" তিনি বললেনঃ "তোমার মধ্যে মুসলমানদের জন্যে দরদ রয়েছে। চারদিন যাবত তুমি আমাদের যেই সেবা করেছো, তাথেকেই বুঝা গেছে।" এমন সময় নবাব জামশেদ সাহেব এসে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ যাবত তাঁদের কথাবার্তা চলে। গাড়ীতে উঠার পূর্বে জিন্নাহ্ সাহেব আমার কাছে এসে বললেনঃ আস্‌সালামু আলাইকুম এবং মোসাফাহা করলেন। তারপর দিল্লী চলে গেলেন। পরে নবাব সাহেব বললেনঃ "কায়েদে আযম তোমার বক্তৃতা আমার কাছে পুনরুল্লেখ করেছেন– আমরা তিনজনই (জিন্নাহ্ সাহেব, ফাতেমা জিন্নাহ্, নবাব জামশেদ) তখন চোখের পানি ফেলছিলাম।"

–"হুযুর! এটা একমাত্র আপনারই বরকত। কথাগুলো বলার সময় মনে হচ্ছিল আপনি এই গোলামের সঙ্গে রয়েছেন– আমার মুখ দিয়ে যেসব কথা আসছিল তা হযরতই বলে চলেছেন। অধীন হযরতের নিকট দোয়ার প্রার্থী।" (২০ই এপ্রিল, ১৯৪৩ লিখিত হাজী বন্ধুর চিঠি)

থানভী সাহেব এই চিঠি পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়ে হাজী বন্ধুকে লিখলেনঃ "আস্‌সালামু আলাইকুম–শাবাশ! "ঈকার আযতূ আইয়েদ ও মরদাঁ চুনী কুনান্দ" .....। আল্লাহ্ তোমাকে এ সম্পদ আরও দান করুন– এ ব্যাপারে উন্নতি দিন। আমি এতে এতই সন্তুষ্ট হয়েছি যে, কোন কিছুই স্মরণে আসছে না।"

জিন্নাহ্ সাহেবের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

উল্লেখিত চিঠিপত্র সমূহের মাধ্যমে হযরত মওলানা থানভী সাহেব ভাবী মুসলিম রাষ্ট্রের কর্ণধার ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের ইসলামী চরিত্রে অধিকারী করার যেই তাবলীগী প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন, তার সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠে। বিশেষতঃ পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ থানভী সাহেবের তাবলীগে কতদূর প্রভাবিত হয়েছিলেন তাও সহজে আঁচ করা যায়। বস্তুতঃ লীগ নেতা মওলানা থানভীকেই তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম মনে করতেন।মওলানা জা'ফর আহমদ উসমানী তাঁর ফুয়েদাদে উল্লেখ করেন ঃ

"হযরত থানভীর ওফাতের পরবর্তী ঘটনা। বোম্বেতে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। তাতে মওলানা শাব্বীর আহ্মদ উসমানী, মরহুম মওলানা মুহাম্মদ তাহের প্রমুখ আলেম অংশগ্রহণ করেন। থানভী সাহেবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বোম্বের কতিপয় ব্যবসায়ী আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তারা বললেনঃ একবার কায়েদে আযমের আলোচনা বৈঠকে এই কথা উঠলো যে, কংগ্রেসে আলেমের সংখ্যা বেশী। মুসলিম লীগে আলেম নেই। ফলে, মুসলিম লীগের ব্যাপারে মুসলমানের মধ্যে তেমন আগ্রহ নেই। কায়েদে আযম উত্তেজিত কণ্ঠে বল্লেন, তোমরা কাদের ওলামা মনে কর?" তাঁরা মওলানা হোসাইন আহ্মদ মাদানী, মওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ্ সাহেব এবং মওলানা আবুল কালাম আযাদের নাম উল্লেখ করলেন। কায়েদে আযম বল্লেনঃ "মওলানা হোসাইন আহ্মদ অবশ্য আলেম, তবে শুনার রাজনীতি কেবল ঐ একটা –ইংরেজের দুশমনী। এই দুশমনীতে তিনি মুসলিম স্বার্থের প্রতিও লক্ষ্য করছেন না। মওলানা কেফায়াতুল্লাহ্ সত্যই মুফতী এবং কিছুটা রাজনীতিকও, তবে আবুল কালাম আযাদ না আলেম না রাজনীতিক। (১) –মুসলিম লীগের সঙ্গে এক মহান আলেম জড়িত রয়েছেন যার এলম, জ্ঞান, চারিত্রিক পবিত্রতা ও তাকওয়া-পরহেযগারী এক পাল্লায় রাখা হলে আর অপর সকল আলেমের এলেম, তাকাদ্দুস-পরহেযগারী অন্য পাল্লায় রাখলে, থানভীর পাল্লাই ভারী হবে। এই মহান আলেমের সমর্থনই মুসলিম লীগের জন্য যথেষ্ট–অন্য কোন আলেম সমর্থন করুক বা না-করুক আমাদের কোন পরওয়া নেই।"

ফলাফল

কায়েদে আযম একজন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তাঁর গোটা জীবনই রাজনৈতিক টানা-হেঁচড়ার ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। এ কারণেই প্রত্যেকের দৃষ্টি তাঁর রাজনৈতিক কার্যাবলীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। শেষের দিকে কেউ তাঁর ধর্মীয়

বিশ্বাসের ব্যাপারে কোনোই আলোকপাত করেনি, যেন ধর্মের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই ছিল না। বরং যখনই তাঁর ধর্মীয় দিকের আলোচনা আসতো, তখন অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিও বিস্ময় প্রকাশ করে বলতেনঃ কায়েদে আযম, আবার ধর্মকর্ম? আপনারা কি যে বলেন? অথচ থানভী সাহেবের তাবলীগী মিশন তাঁর ধর্মীয় জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল– যদিও সেটার কেউ অনুসন্ধান করেনি।

কায়েদে আজমের নামাযের অভ্যাস

মওলানা আশরাফ আলী থানভী তাবলীগী প্রতিনিধি দ্বারা সর্বাগ্রে নামাযের দিকে কায়েদে আযমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক সভায় অনুশোচনা সহকারে নামায না পড়ার অপরাধের কথা স্বীকার করে ভবিষ্যতে নামায পড়তে ওয়াদাবদ্ধ হন। সেই থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রীতিমত নামায পড়েছেলেন বলে জানা যায়। লীগ নেতা যদিও শীয়া পরিবার উদ্ভূত, কিন্তু তাঁর ধর্মীয় তা'লীম থানভী সাহেবের দ্বারা হওয়াতে কোরআন-সুন্নাহরই তিনি অনুসারী হয়ে যান। তাঁকে শীয়া বলা তিনি পছন্দ করতেন না। যেমন, কোয়েটাতে একবার এক শীয়া প্রতিনিধি দল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তারা নিজেদের দাবী-দাওয়া পেশ করে সহানুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে বললঃ আপনি আমাদের সম্প্রদায়ের লোক। কায়েদে আযম জোর দিয়ে তার প্রতিবাদ করে বলে উঠলেনঃ "No I am Muslim" তিনি সম্প্রদায়গত পার্থক্যকে পছন্দ করতেন না। একারণেই দিল্লীর এ্যাঙ্গলো এরাবিক কলেজ হলে অনুষ্ঠিত মুসলিম মহিলা ও ছাত্রীদের এক অধিবেশনে ভাষণদানকালে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, –"ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মধ্যেই এখন মুসলমানদের মুক্তি। ওহাবী ও শীয়া-সুন্নীর মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে হবে।" –(দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, লাহোর, ১৯৪৬ খৃঃ)

তিনি নিজেও একথার উপর অটল ছিলেন। নিজের পৈত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে হামেশা সুন্নী তরীকায় নামায পড়তেন। যখন জামাতে নামায পড়তে হতো, তখন বড়দলের মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন। এ জন্যই শীয়া সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা মাহ্মুদাবাদের রাজা তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ তুলেছিলেন। মওলানা শাব্বীর আলী সাহেব তাই ফুয়েদাদে উল্লেখ করেছেন যে–

"সম্ভবতঃ ১৯৩৯ সালে মে কি এপ্রিলের দিকে জনাব মকবুল হোসাইন বিলগ্রামী থানাভবন এসেছিলেন। তিনি থানভী সাহেবকে বললেন ঃ জিন্নাহ্ সাহেবের উপর হুযুরের তাবলীগী মিশনের বেশী প্রভাব পড়ছে মনে হয়। আমি মাহ্মুদাবাদের রাজা সাহেবের নিকট বসেছিলাম। তিনি সম্প্রতি দিল্লী থেকে

এসেছেন। বল্লেন, আমি আপনাকে এক আশ্চর্য ঘটনা শুনাচ্ছি। তা হলো, জিন্নাহ্ সাহেব রীতিমত পাঞ্জেগানা নামায শুরু করেছেন এবং সুন্নীদের ন্যায় নামায আদায় করেন। এ ঘটনা ১৯৩৯ সালে প্রেরিত থানভী সাহেবের তাবলীগী মিশনের পরের কথা। –(রুয়েদাদ, ১০ পৃঃ)

মওলানা থানভীর প্রভাব ও কায়েদে আযমের খোদাভীতি

সাধারণতঃ দেখা যায়, মানুষ উচ্চ মর্যাদা পেলে বিশেষ করে তা রাতারাতি পেলে আত্মম্ভরিতার শিকারে পরিণত হয়। আল্লাহ্কে ভুলে যায়। যাবতীয় উন্নতি ও যশঃ গৌরবকে নিজের চেষ্টা-তদবীর ও বাহুবলেরই ফল মনে করতে থাকে। কিন্তু কোনো ঈমানদার ব্যক্তি বৈষয়িক দিক থেকে উন্নতির চরম উচ্চ শিখরে আরোহন করেও সে ক্ষণিকের জন্যও নিজের ভুলকে ভুলতে পারে না। তদ্রুপ তাবলীগী প্রতিনিধি দল যখন জিন্নাহ্ সাহেবকে বলে বসলেন– "আপনার উপরও তো নামায ফরয–আপনি পড়েন না কেন?" তিনি চেয়ার থেকে সোজা হয়ে বসে গিয়েছিলেন। দুনিয়ার কোনো শক্তিকে যিনি পরওয়া করতেন না, সেই কায়েদে আযমের অন্তরে "ফরয" কথাটা এতই দাগ কাটলো এবং ভীতির সঞ্চার করলো যে, তিনি কোনো ব্যাখ্যার আশ্রয় না নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে গিয়ে নিজের ত্রুটির কথা অকপটে স্বীকার করে নিলেন এবং বললেনঃ "আমি গুণাহ্গার–অপরাধী। আমাকে বলার অধিকার আপনাদের আছে। এসব শোনা আমার কর্তব্য। আমি ওয়াদা করলাম, ভবিষ্যতে নামায পড়বো।"

অতঃপর নামায শুরু করলে তাঁর মধ্যে এমন খোদাভীতির সৃষ্টি হয় যে, অধিকাংশ নির্জন মুহূর্তে তাঁকে রাববুল আলামীনের দরবারে সিজদায় পড়ে কান্নাকাটি করতে দেখা গেছে। প্রখ্যাত নেতা মওলানা হাসরৎ মোহনীর এক ঘটনা বিবৃত করে মওলানা শাব্বীর আলী লিখেছেনঃ

"আমার এক নির্ভরযোগ্য বন্ধু আমাকে মওলানা হাসরৎ মোহানী সাহেবের একটি বক্তব্য শোনালেন। তিনি বলেছেনঃ আমি একদিন অতি ভোরে এক জরুরী ব্যাপারে জিন্নাহ্ সাহেবের কুটীতে গিয়ে পৌছুলাম। চাকরকে বললাম খবর দিতে। সে বলল, এ সময় আমার ভেতরে যাবার অনুমতি নেই। আপনি তশরিফ রাখুন। অল্পক্ষণ পরে জিন্নাহ্ সাহেব নিজেই তশরীফ আনবেন। আমার জরুরী ব্যাপার ছিল। তাই তাড়াতাড়ি তাকে দিয়ে বলাতে চেয়েছিলাম। চাকরীটার প্রতি রাগ হলো। আমি নিজেই কক্ষে ঢুকে পড়লাম। এক কামরা দুই কামরা পেরিয়ে তৃতীয়

কামরায় গিয়ে পৌঁছুলাম। এ কামরা থেকে গিড়গিড় করে কান্নার শব্দ আসছে। ভেসে আসছে কান্নাজড়িত কণ্ঠের কি কি অস্পষ্ট আওয়ায। জিন্নাহ্ সাহেবের গলার স্বর বুঝে আমি ঘাবড়িয়ে গেলাম এবং আস্তে পর্দা উঠিয়ে দেখি-জিন্নাহ্ সাহেব সিজদায় পড়ে ব্যাকুলভাবে আল্লাহ্র নিকট দোয়া করছেন। আমি পা টিপে আস্তে সরে আসলাম। তাই, আমি এখন যখনই যাই, চাকর যদি বলে ভেতরে আছে, আমি বুঝে নেই যে, তিনি সিজদায় পড়ে দোয়া করছেন। আমার কল্পনায় সকল সময় ঐ একই দৃশ্য আর ঐ একই আওয়ায।"

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রথম দিকে কায়েদে আযম রাজনীতিকে ধর্ম থেকে আলাদা রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু যেদিন মওলানা থানভীর প্রেরিত প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁর কাছে এটা প্রমাণাদিসহ স্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন যে, এর একটিকে আরেকটি থেকে আলাদা রাখা হলে কোনো কল্যাণ ও সফলতা সম্ভব নয় এবং ইসলামের মৌল বিধানের তা পরিপন্থী, তখন থেকেই তিনি ধর্মকে রাজনীতির উপর প্রাধান্য দিতে শুরু করলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু বদলে গেলো। তাতে ইসলামী রং প্রাধান্য পেলো। তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করতে লাগলেন ঃ

"ইসলাম শুধু কতিপয় বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক এবাদাতেরই নাম নয়, বরং রাজনৈতিক, ব্যবহারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক সকল কিছু বিধি-বিধানের সমষ্টির নামই ইসলাম। এ সবগুলোকে নিয়েই আমাদের চলতে হবে।"

ইসলামী কৃষ্টির অনুসরণ

কায়েদে আযমের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইংরেজী পরিবেশে হয়েছিল। তিনি ইংরেজী পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন। মওলানা থানভীর তাবলীগী প্রতিনিধি দল তাঁকে ইসলামী কালচার গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর নিকট যখন ইসলামের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য ও বিধর্মীর সঙ্গে সাদৃশ্যের ক্ষতিকর দিক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখনই তিনি ইংরেজী পোশাকের অভ্যাস ছেড়ে দেন এবং প্রায়ই ইসলামী পোশাকে জনসমক্ষে উপস্থিত হতেন। তারপর থেকেই দেশে জিন্নাহ ক্যাপ, শিরওয়ানী, সেলওয়ার জাতীয় পোশাকের মর্যাদা লাভ করে।

কোরআন চর্চা

থানভীর তাবলীগী মিশনের বদৌলতে পাকিস্তান আন্দোলনের নেতার মধ্যে কোরআন শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তিনি কোরআন মজিদ ও অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য মনযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে শুরু করেন। তাতে তাঁর চিন্তাধারায় দ্রুত

পরিবর্তন দেখা দেয়। ১৯৪১ সালে দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদে যখন ছাত্ররা তাঁকে ধর্ম ও ধর্মীয় রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদান সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, তিনি স্বয়ং তার জবাবে এটা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন যে,

"আমি যখন ইংরেজী ভাষায় ধর্ম (Religion) কথাটি শুনতে পাই তখন ঐ ভাষায় ও তার প্রচলিত অর্থ অনুযায়ী অবশ্যই আমার দৃষ্টি স্রষ্টা ও তাঁর বান্দার পারস্পরিক সম্পর্কের দিকটির প্রতি চলে যায়। কিন্তু এটা আমি ভালো করেই জানি যে, ইসলাম এবং মুসলমানদের নিকট ধর্ম কথাটি এই সীমাবদ্ধ অর্থ বা মতবাদ হিসাবে গৃহীত নয়। আমি কোনো মোল্লা-মৌলভী নই–ধর্মীয় ব্যাপারে অভিজ্ঞতারও আমি দাবী করতে পারি না। তবে আমি নিজে নিজে কোরআন মজিদ ও ইসলামী আইন স্টাডি করে দেখেছি–এই মহাগ্রন্থের শিক্ষা-আদর্শে মানবজীবনের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে বিধি-বিধান মওজুদ রয়েছে। জীবনের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক-এক কথায় কোনো একটি দিক বা বিভাগ এমন নেই, যা কোরআনের নীতির বাইরে থাকতে পারে। কোরআনের নীতি-নির্ধারক এসব বিধান কেবল মুসলমানের জন্যই কল্যাণকর নয়, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের সঙ্গে সৎ, আচরণ এবং তাদের আইনগত অধিকারও তাতে স্বীকৃত রয়েছে। এর চাইতে শাসনতান্ত্রিক অধিকার কল্পনা করা অসম্ভব।" –(হায়াতে কায়েদে আযম, ৪২৭ পৃঃ)

আল্লাহর প্রতি ভরসা

কায়েদে আযমের বিভিন্ন প্রকারের যোগ্যতা, বৈশিষ্ট্য ও গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর উপর নির্ভর করতেন। তিনি গোটা স্বাধীনতা সংগ্রাম লড়েছেন এই শক্তি বলেই। দুশমন যখনই তাঁর জাতির উপর শক্তি-বিক্রমের দাপট দেখিয়ে তাঁকে প্রভাবিত করতে চেয়েছে, তিনি তখন জাতিকে অভয় দিয়ে বলেছেন, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। কোনো পর্যায়ে জাতির মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিলে তিনি আল্লাহর সাহায্য কামনা করতেন এবং তাঁরই ভরসার এই বিস্মৃত বাণী শুনিয়ে জাতিকে চাঙ্গা করে তুলতেন। এভাবে আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা জাতীয় জীবনের প্রতিটি সংকটে জয়যুক্ত হয়েছে।

১৯৪৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা দিবসের উৎসবে শিখরা কায়েদে আযমকে বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল। এ ব্যাপারে বৃটিশ ভারতের সর্বশেষ ইংরেজ গভর্ণর লর্ড মাউন্ট বেটেন অবহিত ছিলেন। যেহেতু ভারত থেকে ইংরেজদের তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিতে কায়েদে আযমের সূক্ষ্ম বুদ্ধিই শেষের দিকে অধিক কাজ করেছিল, তাই ইংরেজরা তাঁকে তেমন ভালো চোখে দেখতেন না। লর্ড

মাউন্ট বেটেন প্রথমে তা কায়েদে আযমকে জানাননি। কিন্তু স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কায়েদে আযম যখন মাউন্ট বেটেনকে রাজধানী করাচীতে আসার আমন্ত্রণ জানান, তখন তিনি ওজর পেশ করে লিখলেনঃ এ দিবস উপলক্ষে শিখেরা আপনাকে বোমা দিয়ে হত্যা করার পরিকল্পনা সম্পন্ন করে ফেলেছে। এ পরিস্থিতিতে যেমন আপনার জন্য শোভাযাত্রা বের করা সংগত নয়, তেমনি আমারও ঐদিন তাতে অংশ গ্রহণ ঠিক হবে না।"-(মিশন, লর্ড মাউন্ট বেটেন)

কিন্তু তিনি এ সংবাদের কোনোই পাত্তা দিলেন না। মাউন্ট বেটেনকে অভয় দিয়ে বললেন-আল্লাহ্ রক্ষা করবেন। তিনি যেন নিশ্চিন্ত থাকেন। অতঃপর করাচী আসার পর তাঁকে নিয়ে কায়েদে আযম খোলা গাড়ীতে করে লাখো জনতার মধ্য দিয়ে নিরাপদে গভর্ণমেন্ট হাউসে গিয়ে পৌছেন। মাউন্ট বেটেনকে ইচ্ছাকৃতভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি নিরাপদ। লর্ড মাউন্ট বেটেন তখন হাঁপাতে হাঁপাতে জিন্নাহ্ সাহেবের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর আস্থার ভূয়সী প্রশংসা করছেন।

আজাদী আন্দোলনের শেষ পর্যায়ের সফলতাকে যারা কেবল কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র রাজনৈতিক প্রজ্ঞারই ফল মনে করেন, তারা অবশ্যই ভুল করেন। কারণ, কায়েদে আযমের সফলতার মূল রহস্য তাঁর রাজনীতিতেই কেবল নিহিত নয়; বরং তাঁর সততা, খোদাভীরুতা ও খোদার প্রতি আস্থাশীলতার মধ্যেই তাঁর সফলতার আসল রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে। মওলানা থানভীর হেদায়াতের পূর্বে তিনিও অন্যান্য জননেতার মতোই একজন নেতা ছিলেন মাত্র। -তখনও 'প্রিয় নেতা'র মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন না। জিন্নাহ্ সাহেবের চিন্তা ও চরিত্রে ধর্মীয় বিপ্লব আসার বরকতেই (১) তাঁর অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি বিধানে প্রেরণা জাগে, (২) তাঁর ভাষায় যাদুমন্ত্রের প্রভাব সৃষ্টি হয়, (৩) জনগণের হৃদয়ে তাঁর গুরুত্ব, ভালবাসা, সমাদর বৃদ্ধি পায় এবং (৪) দুশমনের হৃদয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব ভীতির সঞ্চার করে, তিনি লাভ করেন দুনিয়ার সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র। তবে এর অর্থ এও নয় যে, তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কোনো গুরুত্ব ছিল না। বরং এটা উপলব্ধি করা দরকার যে, জিন্নাহ্ সাহেবের রাজনীতির দৃষ্টান্ত হচ্ছে ওযুর ন্যায়। নামাযের বিশুদ্ধতা ওযুর উপর নির্ভরশীল হলেও ওযু মূল লক্ষ্য নয়, বরং উপলক্ষ মাত্র এবং নামাযই হলো আসল লক্ষ্য। এসব বাস্তবতার আলোকে পাঠকই বিচার করতে সক্ষম হবেন যে, মওলানা আশরাফ আলী থানভী এই মহান জাতীয় নেতার চিন্তা ও চরিত্রে কিরূপ পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন, যার সুফল হয়তো জিন্নাহ্ সাহেব আরও দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকলে জাতি অবশ্যই ভোগ করতে পারত।

আজাদী আন্দোলন ঃ
মওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী

একটি পর্যালোচনা ঃ ইতিপূর্বেকার আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভীর চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকল্পে এ পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বাতিল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে শাহ্ আবদুল আযীযের প্রচেষ্টায় যে ইসলামী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল, তারই ফলশ্রুতি হিসেবে পরিচালিত হয়েছিল ১৯৩১ সালের বালাকোট যুদ্ধ ও ১৮৫৭ সালের জাতীয় বিপ্লব; আর সে বিপ্লব ব্যর্থ হবার পরই ওয়ালিউল্লাহ আন্দোলনের পরবর্তী কর্মীবৃন্দের প্রচেষ্টায় ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে প্রায় দশ বছর পর ১৮৬৭ সালে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু যে মুহূর্তে উপরোল্লেখিত মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল, তার কয়েক বছর পর দারুল উলুমের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা কাসেম নানতুবীরই সহপাঠী স্যার সাইয়েদ আহ্মদের প্রচেষ্টায় আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে ১৮৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়। দারুল উলুম দেওবন্দের ভূমিকা যেখানে ছিল ইসলামী ভাবধারার বিকাশ দান ও ইংরেজ উচ্ছেদের মাধ্যমে এদেশে ইসলামী হৃত মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা, সে ক্ষেত্রে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো ইংরেজদের ভাষা শিক্ষা করে রাষ্ট্রীয় কায়কারবারে অংশ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন এবং যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আগে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও কাঁটা দিয়ে কাঁটা উঠাবার অভিপ্রায় নিয়ে। অবশ্য তাতে ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল।

কিন্তু আলীগড়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সাইয়েদ আহমদ তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য করে উপরোক্ত উদ্দেশ্যে এই কর্মপন্থা অবলম্বন করলেও তিনি হয়তো একথা চিন্তা করেননি যে, তাঁর প্রতিষ্ঠানে মুসলিম স্বকীয়তাবোধের চেতনা আশানুরূপ বহাল থাকবেনা। এখানকার শিক্ষিতদের দ্বারা আজাদী আসলেও ইসলাম আসা কঠিন হবে। উপমহাদেশের মুসলমানগণ এযাবত যেই সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে এসেছে, তাতে তাঁর অনুসৃত নীতির ফলে পরবর্তী পর্যায়ে এক শ্রেণীর পরাজিত মনোভাবের মুসলমান সৃষ্টি হবে, যারা ভোগবাদী পশ্চিমের মতবাদের কাছে সহজেই নতি স্বীকার করে বসবে আর বালাকোটের ইসলামী প্রেরণা সম্মুখীন হবে বিরাট চ্যালেঞ্জের । কেননা, মুসলমান একটি আদর্শিক জাতি; আর কোনো আদর্শিক দল বা জাতি যদি অপর জাতির জীবন বোধ ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি অভিভূত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের স্বকীয়তাবোধ হ্রাস

পেতে থাকে, তাহলে তারা ভীরুতা, হীনমন্যতা ও বৈপরীত্যের শিকার হয়ে পড়ে। তাই এ ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। বিশেষ করে ইংরেজরা যেখানে ভারতের নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হবার পর থেকেই শিক্ষা-সংস্কৃতি নানান দিক থেকে এদেশের মুসলমানদের চিন্তাধারায় পাশ্চাত্য সভ্যতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ভাবধারার ছাপ বসানোর পরিকল্পনায় লিপ্ত ছিলো, যেখানে তাদের পরিকল্পনা হলো– এদেশের সংগ্রামী জাতি মুসলমানদের বশে আনার জন্য এমন ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যাতে মুসলমানরা বর্ণ ও আকৃতিতে ভারতীয় থাকলেও মনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ইংরেজ-মানসিকতা সম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠবে, সেক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক শিক্ষিতদের পেয়েতো তারা খুশীতে আত্মহারা। কেননা, এদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ইংরেজভক্ত না হলেও অন্ততঃ কিছু কিছু নমনীয় মনোভাবের মুসলমানতো এদেশে সৃষ্টি হবেই। আর ইংরেজদের এ নীতি কেবল অবিভক্ত ভারতেই নয় গোটা পরাধীন মুসলিম বিশ্বেই তারা একই নীতির অনুসরণ করে চলেছিল। তারই পরিনতি হিসেবে আজ বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই নিজেদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি উন্নাসিক এক শ্রেণীর পরাজিত মনোভাব সম্পন্ন শিক্ষিত মুসলমানের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। তারা ইসলামের শাশ্বত সুন্দর কৃষ্টি-সভ্যতা ও জীবনাদর্শকে বাদ দিয়ে আমেরিকা-ইউরোপের বস্তুবাদী, মানবতাবিধ্বংসী, প্রাণহীন, শুষ্ক, উচ্ছৃংখল নগ্ন সভ্যতার কাছে পদে পদে নতি স্বীকার করছে। ইংরেজ প্রভুদের বিদায়ের পর পাশ্চাত্যের এইসব ভক্তবৃন্দ মুসলিম বিশ্বের ক্ষমতায় সমাসীন হয়ে স্থানীয় মুসলমানদের বিশ্বাসে আঘাত হেনে চলেছে। তাদের ধ্যান-ধারণা ও জীবনধারার ব্যতিক্রম সম্পূর্ণ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনীতি পরিচালনা করছে। মুসলিম মিল্লাতকে আজ তারা এভাবেই বিপদের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। তবে বাংলা-পাক-ভারতের ব্যাপারে কিছুটা রক্ষা এই যে, এখানে স্যার সাইয়েদের উপরোক্ত ভূমিকার পাশাপাশি দেওবন্দ আন্দোলন সক্রিয় ছিলো। তাই আলীগড়ে শিক্ষা লাভের পরও দেখা গেছে যে, অনেকে দেওবন্দের সংগ্রামী আলেমদের কাতারে গিয়ে আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন, যাদেরকে পারেনি হজম করতে ইংরেজী কৃষ্টি-সংস্কৃতি। অন্যথায় এখানে মুসলিম জাতীয়তাবোধের যে কি পরিণতি ঘটতো তা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

এভাবে একদিকে দারুল উলুম দেওবন্দ ও অপরদিকে আলীগড় মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করে যায়। মূলত ঃ সে সময় থেকেই বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম মিল্লাতের মধ্য থেকে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারা সম্পন্ন এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের সৃষ্টি হতে থাকে। তারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইংরেজ সরকারের অধীনে রাষ্ট্রীয় কায়কারবারে অংশ নিয়ে অপেক্ষাকৃত আরামে জীবন-যাপন করতে থাকে আর ইংরেজী শিক্ষার ধর্মহীন

পরিণতিতে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অপরদিকে, আলেম সমাজ আপোষহীন-ভাবে তাঁদের সংগ্রামী ভূমিকার উপর অটল থাকেন এবং শাহ আবদুল আযীযের ইংরেজ-বিরোধী ফতওয়ার প্রেক্ষিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একদিকে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী ভাব জাগ্রত রাখেন, অপরদিকে নৈতিকতা, সমাজ সেবা, ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে স্থানে স্থানে মাদ্রাসা-মসজিদ স্থাপন করেন। অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে চরম দারিদ্রপীড়ায় জর্জরিত হয়ে তারা দেশ ও সমাজের কাজে নিয়োজিত থাকেন। দেশ, জাতি ও জাতীয় আদর্শকে রক্ষাকল্পে উপমহাদেশের আলেমদের এই ত্যাগ ও তিতিক্ষার নযীর ইতিহাসে অতি বিরল।

সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, ইসলাম ও মুসলমানদের এই মহাপরীক্ষার দিনে কঠোর দারিদ্রের সম্মুখীন হয়েও আলেম সমাজ মুসলিম জাতির দুশমন ইংরেজ সরকারের নিকট কোনোদিন অর্থের জন্যে হাত পাতেননি, যা কিছু করেছেন মুসলমানদের সাহায্য-সহানুভূতিতেই করেছেন। এমনকি বড় বড় ইংরেজ কর্তৃত্বশালীরা যখন স্বেচ্ছায় অর্থদানের উদ্দেশ্যে দারুল উলুম দেওবন্দ ও এর শাখা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব দিয়েছেন, সে সময়ও দেখা গেছে যে, তাদের অর্থ গ্রহণতো দূরের কথা বরং আত্ম মর্যাদাবোধ-সম্পন্ন মহাপ্রাণ আলেমগণ কিতাব পড়ানো বাদ দিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের সম্মান করাকেও ঘৃণার চোখে দেখেছেন। ইংরেজদের প্রতি তাঁরা কিরূপ ভীতশ্রদ্ধ ছিলেন, এ থেকেই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এভাবে ইংরেজদের ভাষা, কৃষ্টি- সভ্যতা, সংস্কৃতি সকল কিছুর বিরুদ্ধেই জাতীয় মর্যাদাবোধ সম্পন্ন এ সব সংগ্রামী আলেমের মধ্যে প্রচণ্ড ঘৃণার ভাব বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, জাতির এহেন নিঃস্বার্থ সেবকরাই পরবর্তী পর্যায়ে গিয়ে ইংরেজ মানস সন্তানদের ভাষায় আখ্যায়িত হলেন 'মোল্লা' হিসেবে আর তাঁরা নিজেরা সাজলেন 'মিষ্টার'। উল্লেখ্য, অনেকে এই সেদিন পর্যন্তও –"আলেমরা ইংরেজী শিখতে নিষেধ করে মুসলমানদের সর্বনাশ করেছে"–এই বলে সাধারণ সমাজের কাছে তাঁদের হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতো।

অথচ আসল ব্যাপার ছিল এই যে, ইরেজরা যখন মুসলমানদেরকে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জীবন দর্শনের গোলামে পরিণত করার হীন ষড়যন্ত্র চালাচ্ছিল, তখন জাতীয় আত্মমর্যাদাসম্পন্ন তৎকালীন আলেম সমাজ এ জাতিকে তাদের মারাত্মক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন আর সেটাকেই এক শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিত লোক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভিন্নরূপ 'কালার' দিয়ে প্রচারণা চালায়। আলেম সমাজ তাঁদের এই স্বকীয়তা ও জাতীয় মর্যাদাবোধের

জন্যে যেখানে ধন্যবাদ পাবার যোগ্য ছিলেন, সেক্ষেত্রে উল্টো তাঁদেরকে অভিযুক্ত করা হলেও একথা আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, মুসলিম জাতির অধঃপতনের মূল কারণই ছিল ঐ 'স্লো পয়জন'টি। আলেমদের ন্যায় গোটা মুসলিম জাতি নিজেদের স্বকীয়তাবোধ নিয়ে সেদিন অটল থাকতে পারলে এবং ইংরেজী সভ্যতা-সংস্কৃতির সয়লাবে ভেসে না গেলে একটি আদর্শিক জাতি হিসেবে মুসলমানদের অস্তিত্ব কিছুতেই আজকের এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতো না। আলেমগণ সেদিন একথাই বলেছিলেন যে– ইংরেজদের গোলামী করে তাদেরকে টিকিয়ে রাখার নিয়তে ইংরেজী শিক্ষা করা ঠিক নয়, তবে কাঁটা দিয়ে কাঁট উঠাবার মনোভাব নিয়ে কেউ যদি ইংরেজদেরকে এদেশ থেকে তাড়ানো ও ইসলামী শিক্ষা আদর্শের বিকাশার্থে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করে, সেটা দোষের কিছু নয়। কিন্তু তাদের এই ভূমিকার কদর্থ করা হলো। সময়ের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরিত্যক্ত ইংরেজী ভাষাকে পুনরায় যদি মুসলমানদের জন্য জরুরী মনে করাকে একটি দূরদর্শিতার কাজ ধরা যায় এই বিরাট কাজটিও করে ছিলেন মূলতঃ আলেমরাই। কারণ, যেই স্যার সাইয়েদ আহ্‌মদ এবং সাইয়েদ আমীর আলী ও নবাব আব্দুল লতিফ মুসলমানদেরকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইংরেজী শিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তারাও মাদ্রাসাপাশ আলেমই ছিলেন। আলেম সমাজ পাইকারীভাবে অভিযুক্ত হলেন; যদিও ৫০-এর দশকে দেশীয় ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে ইংরেজী সাইনবোর্ড ভাঙ্গার মধ্য দিয়ে আমাদের যুব সমাজ শতাব্দীকাল পরে আলেমদের অনুসৃত সেই সত্য উপলব্ধির বাস্তব প্রমাণ দিল।

যা হোক, দেওবন্দ ও আলিগড়- এই উভয় প্রতিষ্ঠানের কাজ পাশাপাশি চলতে থাকে। একটি ইংরেজদের প্রতি নমনীয় ভূমিকায়, অপরটি তাদের রক্তচক্ষুর কড়া পাহারায়। দারুল উলুম দেওবন্দকে ইংরেজরা নানানভাবে কোণঠাসা রাখতে সচেষ্ট ছিল। এজন্য এই প্রতিষ্ঠানটিকে নানা ঘাত-প্রতিঘাত, বাধা-প্রতিবন্ধকতা ও আঘাতের পর আঘাত সামলিয়ে সতর্কতার সহিত সম্মুখে অগ্রসর হতে হয়েছিল, যার ফলে সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করতে করতে এ প্রতিষ্ঠানটিকে শেষ পর্যন্ত নিজের অলক্ষ্যেই তার প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য থেকে অনেকটা পিছু হটতে হলো। বালাকোটের পূর্ণাঙ্গ ভাবধারাকে সময়োপযোগী করে সম্মুখে অগ্রসর করার পরিবর্তে সে কোন মতে একে টিকিয়ে রাখার কাজেই নিজেকে ব্যস্ত রাখলো।

আজাদী আন্দোলনের শেষ পর্যায়েও দেওবন্দী কর্মীদের যে সংগ্রাম আমরা দেখতে পাই, সেটা বালাকোট আন্দোলনের অংশ ছিল বটে সন্দেহ নেই, কিন্তু ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিকূলতার দরুণ দারুল উলুম দেওবন্দ মওলানা মাহ্‌মুদুল হাসানের পরে এমন এক পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে,

সে বালাকোট আন্দোলনের মূল প্রেরণার উৎস শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে সর্বাঙ্গীনভাবে আঁকড়ে ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। ফলে এ প্রতিষ্ঠানটি শেষ পর্যায়ে শিক্ষানীতির দিক থেকে সাধারণ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে নেমে আসলো। উপমহাদেশের সকল দ্বীনি শিক্ষার পাদপীঠ এই প্রতিষ্ঠান ও এর শাখা-প্রশাখা- সবগুলো মূলতঃ ইসলামের আনুষ্ঠানিক এবাদত সমূহের শিক্ষাদান কেন্দ্র হিসাবেই কাজ করতে থাকলো। " ইকামতে দ্বীন" "ইজহারে দ্বীন" ও 'তা'সীসে' খেলাফতে ইসলামিয়ার ভাব গৌন হয়ে গেল। ইসলামী অর্থনীতি, রাজনীতির আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের অনুভূতি ও প্রেরণা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুসৃত শিক্ষানীতিতে এক রকম অনুপস্থিত হয়ে পড়ে। এমন কি পরিস্থিতির এতটুকু পর্যন্ত অবনতি ঘটল যে, অনেক বড় বড় খ্যাতনামা আলেমের মধ্যেও আধুনিক যুগ-সমস্যার মোকাবেলায় একটি ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখার ধারণা অনুপস্থিত ছিল। তাঁরা মনে করতেন, রাষ্ট্র পরিচালনার সামগ্রিক দায়িত্বতো পালন করবেন অন্যেরা, আমরা কেবল প্রচলিত দ্বীনি খেদমত আনজাম দিতে পারলেই হলো। আর সাধারণ আলেমদের তো প্রশ্নই ওঠে না। কেননা, দ্বীনি চিন্তায় বিভ্রাটের দরুণ এবং মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষানীতির ভ্রান্তির ফলে এ সব প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ দিন যাবত ওসুল-ফিকাহ সহ অসংখ্য কিতাব, হাদীস তাফসীর ও কোরআন মজীদ অধ্যয়নের পরেও তাদের মধ্যে এ ধারণাই বদ্ধমূল থাকতো যে, ইসলাম কেবল মসজিদের চার দেওয়াল, মাদ্রাসা, খানকাহ্ তথা নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত, যিকির-আযকার এ কয়টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ,এর সঙ্গে আবার এসেম্বলি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানের কি সম্পর্ক? অথচ সমাজকে যথার্থ ইসলামী সমাজে পরিণত করতে হলে, সমাজ গঠনের প্রধান ৫টি বিভাগ নিয়ন্ত্রণে আনা না হলে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। (১) রাষ্ট্রীয় আইন, (২) শিক্ষা ব্যবস্থা (৩) প্রচার মাধ্যম (৪) সামরিক ব্যবস্থা (৫) অর্থ ব্যবস্থা- এসব বিভাগ আবু জাহ্ল আবু লাহাবদের হাতে তুলে দিয়ে যারা রাজনীতি নিরপেক্ষ ইসলাম কায়েম করতে চায়, এর সাথে মহানবীর ইসলামের যেমন সম্পর্ক নেই তেমনি তাতে ইসলামের লক্ষ্য অর্জনও সম্ভব নয়। ৫ ইঞ্চি পাইপ দিয়ে ময়লা ছড়ানো হলে কোয়াটার ইঞ্চি পাইপ দিয়ে আতর ছিটানোতে কখনও দুর্গন্ধ দূর করা সম্ভব নয়। এ জন্যে আগে ৫ ইঞ্চি পাইপের উৎস মুখ বন্ধ করতে হবে। এক কথায়, ইসলাম যে একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ জীবনবিধান এবং যেকোনো রাষ্ট্রে এর বিধি-ব্যবস্থা সর্বত্র চালু করলে একটি শোষণহীন শান্তিপূর্ণ সমাজ কায়েম হতে পারে—এ ধারণাটিই তাদের মধ্য থেকে এক রকম লোপ পেয়ে গিয়েছিল। আর লোপ যে পেয়েছিল তার বড় প্রমাণ হচ্ছে আমাদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্য ওলামা নেতৃত্বের অভাব। অন্যথায়, গত কয়েক দশকে এ দেশের মাদ্রাসাগুলো থেকে কম আলেম বের হয়েছে কি? ইসলামী

শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও ভাবধারার সঠিক অনুভূতি ও সে অনুযায়ী শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের অভাবেই এহেন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। পক্ষান্তরে মাদ্রাসায় না পড়েও কিছু লোকের মধ্যে সেই ভাবধারা সৃষ্টির ফলে তারা ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

এভাবে দেখা যায়, একদিকে ধর্মীয় চিন্তার এই অবস্থা, অপরদিকে দুশো বছর স্থায়ী ইংরেজ প্রভুত্বের প্রভাবে উনিশ শতকের শেষের দিকে মুসলমানরা ক্রমে ইংরেজী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে কেউ ধর্মনিরপেক্ষতা, কেউ কম্যুনিজম, কেউ প্রকৃতিবাদ, কেউ খৃষ্টানিজম, কেউ হীনমন্যতা, কেউ যুক্ত-জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি ভ্রান্ত মতাদর্শের শিকারে পরিণত হয়। কিছু কিছু আলেমও এ বিভ্রান্তিতে নিপতিত হন। তাদের দু'এক জন পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ কম্যুনিজমের অর্থ ব্যবস্থার গোলক ধাঁধাঁয়ও পড়েছিলেন, আবার উল্লেখযোগ্য অংশতো নিজেদের অলক্ষেই হিন্দু-মুসলিম যুক্ত-জাতীয়তার সমর্থনে রীতিমতো আন্দোলনই করেছেন।

এক কথায়, মুসলিম সমাজ আদর্শচ্যুতির গভীর খন্দকের প্রতি দ্রুত এগিয়ে চলছিলো। সকলেই জীবনকে নিছক বৈষয়িক উন্নতি ও জীবিকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইংরেজী শিক্ষা ও ভাবধারার প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো। স্কুল-কলেজের শিক্ষার দিকে অধিকাংশ মুসলমান মনোযোগী হয়ে পড়লো এবং সে অনুপাতে জীবন গঠনকেই গর্ব মনে করতে থাকলো। মাদ্রাসাগুলো কোনো প্রকারে ইসলামের নিভু নিভু আলোটুকু তখনকার মতো জ্বালিয়ে রাখলো। অপরদিকে তাঁর পাশাপাশি আজাদী আন্দোলনতো অব্যাহত আছেই।

এগিয়ে এলেন বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইর মহান সিপাহ্‌সালার

কিন্তু তখন যে বিরাট জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছিল তা হলো, দেশ আজাদ হলেও ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক দিক থেকে পাশ্চাত্যের বিপরীতমুখী এসব ভ্রান্ত দর্শন ও চিন্তার শতমুখী সয়লাব থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করবে কে? আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে ঠিক ঐ সময়ই বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী চিন্তানায়ক, চিশতিয়া তারিকার প্রবর্তনকারী খান্দানের উজ্জ্বল তারকা, আওলাদে রসূল মহামণীষী হযরত মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আত্মপ্রকাশ করেন। মওলানা মওদূদী (রহঃ) ছিলেন তাঁর সমকালীন বিশ্বের মুসলিম মিল্লাতবিরোধী পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শিবির ও কম্যুনিষ্ট শিবিরের বড় আতঙ্ক। ইসলামের পক্ষে পাশ্চাত্য সভ্যতা, শিক্ষা-সংস্কৃত ও যাবতীয় ভ্রান্ত দর্শন মতবাদের জন্যে প্রচণ্ড এক চ্যালেঞ্জস্বরূপ।

মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ১৭ বছর বয়সে বড় ভাইয়ের সঙ্গে সাংবাদিকতার মাধ্যমে তাঁর কর্ম জীবনের সূচনা করেন। মাত্র ২০ বছর বয়সের সময় প্রথমে জব্বল পুরের 'তাজ' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। তারপর তিনি দিল্লীর বিখ্যাত আল-জমিয়ত পত্রিকায়ও কিছুদিন সম্পাদনার কাজ করেছিলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদনা কাজে ব্যাপৃত থাকেন। ১৯২৯ সনে তাঁর বিখ্যাত গবেষণামূলক গ্রন্থ 'আল-জিহাদ ফিল ইসলাম' প্রণয়ন করেন। ১৯৩২ সালে ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে তাঁর মাসিক 'তারজুমানুল কুরআন' দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ শহর থেকে প্রকাশ পেতে থাকে। এই পত্রিকার মাধ্যমেই মওলানা মওদূদী উল্লেখিত পরিস্থিতির পটভূমিতে নানামুখী সমস্যার আবর্তে বিভ্রান্ত উপমহাদেশের মুসলমানদের অতীত, বর্তমান নিয়ে গভীর পর্যালোচনা করেন এবং তাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, চিন্তাগত সকল বিষয়ের ভবিষ্যত কর্মসূচী নির্দেশ করেন।

বালাকোটের জেহাদের পর মোজাহেদ আন্দোলন যখন বিভিন্ন প্রতিকূলতার দরুণ ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে থাকে, তখন দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ওলামায়ে কেরাম শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামী ধারাকে সঞ্জীবিত রেখে মুসলিম জাতির মনে কিছুটা আশার সঞ্চার করতে সক্ষম হন বটে, কিন্তু ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন পরিচালনা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই ধীরে ধীরে মুসলিম জাতির মনে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সামাজিক, নৈতিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নৈরাশ্য বাসা বাঁধতে থাকে এবং এই সুযোগে পাশ্চাত্য চিন্তা-ভাবধারা আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতি তথা জীবনের সর্বস্তরে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পায়। মওলানা মওদূদী তখন প্রাচীন, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য মতবাদসমূহ হজম করে আদর্শিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের বুদ্ধিবৃত্তিক নতুন হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হন। তাঁর সমগ্র চিন্তা গবেষণা অনৈসলামিক প্রভাবের মূলে চরম কুঠারাঘাত হানতে থাকে। এভাবে তাঁর যুক্তি ও চিন্তা-গবেষণালব্ধ দিক-নির্দেশনা জাতিকে নৈরাশ্যের অন্ধকার আবর্ত থেকে আলোর রাজপথ দেখাতে থাকে, যার প্রভাব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গিয়ে পড়ে।

মওলানা মওদূদীর প্রথম দিকের কাজ ছিল গবেষণা পর্যায়ের

প্রথম দিকে তাঁর কাজ ছিল গবেষণার পর্যায়ে। তিনি ঐ সময় ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠনের মাধ্যমে সত্যকার ইসলামী রেনেসাঁ সৃষ্টির কর্মসূচী ও ফরমূলা তৈরীতে ব্যস্ত ছিলেন। এ জন্যে প্রথমেই তিনি তওহীদের মূলমন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে মুসলমানদের মন-মগজ থেকে ইংরেজ বা যেকোনো শক্তির প্রাধান্যের ভাব দূরীভূত করার চেষ্টা করেন এবং মুসলমানদের পতনের মূল কারণসমূহ দার্শনিক যুক্তিতর্ক সহকারে ব্যাখ্যা করে তাদের মধ্য থেকে হীনমন্যতার ভাব দূর করার চেষ্টা করেন।

আব্বাসীয় শাসনামলে বিজাতীয় গ্রীক চিন্তাধারা মুসলমানদের যেমন হীনমনা করে তুলেছিল আর আবুল হাসান আশয়ারী ও ইমাম গাযযালী প্রমুখের শাণিত যুক্তি সেগুলোকে খান খান করে দিয়ে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করেছিল, মওলানা মওদূদী (রহঃ)-ও একই ভূমিকা পালন করেন। যেভাবে আকবর-জাহাঙ্গীরের আমলে যাবতীয় কুসংস্কারের উৎপাটন করে মুজাদ্দিদে আলফে সানী ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেভাবে বুদ্ধির বন্ধ্যাত্ব দূর করে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রহঃ) দ্বীনি চিন্তার পুনর্গঠন করেছিলেন এবং যাবতীয় চিন্তাগত আবিলতাকে সরিয়ে দিয়ে আধুনিক কায়দায় ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির উজ্জ্বল কাঠামো ও রূপরেখাসমূহ তুলে ধরেছিলেন, তেমনিভাবে মওলানা মওদূদীও সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য সভ্যতার যাবতীয় দর্শন ও চিন্তা-ভাবধারার কাঁটাঝাড়া সমালোচনা করে মানব কল্যাণে সেগুলোর অসারতা ও ব্যর্থতা বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করেন। ইসলামকে একটি বিজয়ী ও সর্বকালের উপযোগী জীবন বিধান হিসেবে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক যাবতীয় সমস্যা সমাধানের সুষ্ঠু মাধ্যম ও মানবজাতির জন্যে একমাত্র মুক্তিসনদ রূপে সমাজের কাছে তিনি তুলে ধরেন। ইসলামী দর্শন, ইসলামী রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কীয় তাঁর ক্ষুরধার লেখনী কেবল উপমহাদেশ ও মুসলিম বিশ্বেই নয় বরং গোটা দুনিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ কারণেই বর্তমান বিশ্বের অমুসলিম দু'টি মোড়ল শক্তি পুঁজিবাদ ও কম্যুনিষ্ট শিবিরদ্বয়ের স্থানীয় এজেন্টরা মওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণায় লিপ্ত হয়। মুসলিম সমাজে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগে। এদেশের মুসলমান সামগ্রিকভাবে মওলানা মওদূদীকে চিনতে না পারলেও ঐ সকল ইসলাম বিরোধী মহল বুঝতে পারে যে, তারা নিজেরা যেখানে কেউ বস্তুবাদী এবং ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার শ্লোগান তুলে, কেউ মার্কস, লেনিন, স্টালীন ও মাও-সে-তুংগের ভ্রান্ত চিন্তাধারায় নিজ নিজ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে মুসলমান ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতির উপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছে, তেমনিভাবে মওলানা মওদূদীর বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকেও কেন্দ্র করে যদি মুসলিম জাহান আরেকবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে, তা হলে তাদের মোড়লীর আসন কেঁপে উঠবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, ইসলামের আন্তর্জাতিক বৈরী শক্তিরাতো তাঁর বিরুদ্ধে কাজ করছেই, পরন্তু সূক্ষ্মভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মমতের অনুসারী কিছু আলেম- পীরও না বুঝেই তার বিরোধিতায় লাগেন, যদিও নবী মুহাম্মদ (সাঃ)- এর দ্বীন ও আমাদের খোলাফা-এ-রাশেদীনের দ্বীন রাজনীতি নিরপেক্ষ নয়।

বিশ শতকের শুরুতে মওলানা মওদূদী মুসলমানদের চিন্তার পুনর্গঠন ও পরিশুদ্ধির কর্মনীতির সঙ্গে সঙ্গে যেসব সামাজিক সমস্যার আঘাতে জাতি জর্জরিত হয়ে পড়েছিল, সেগুলো সম্পর্কে মুসলমানদের সতর্ক করে তোলেন। যে-সব বিকৃতি জাতির

রাজনৈতিক সংগ্রামকে দুর্বল করে দিচ্ছিলো, সেগুলোর দিকেও তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। সর্বোপরি যে বিশিষ্ট ধারায় জাতির সামাজিক আন্দোলন ও কর্মপ্রচেষ্টাকে সংহত করে আজাদী ও ইসলাম উভয়কেই এক সাথে অর্জন করা যেতে পারে, সে ধারাটিকেও তিনি স্পষ্টতর করে তোলেন। এ জাতীয় প্রবন্ধ মওলানা মওদূদী ১৯৩৬ সালে লিখতে শুরু করেন এবং তাঁর সম্পাদিত মাসিক "তারজুমানুল কোরআন" পত্রিকায় ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এগুলো আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। অতঃপর সেগুলো "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশ্মকাশ"– মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত–নামে দু"খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এসব প্রবন্ধ সমকালীন মুসলিম জাতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে, অখণ্ড জাতীয়তার ধারণাকে খণ্ডন করে এবং ইসলামী জাতীয়তার চেতনাকে দৃঢ়তর করে একে একটি রাজনৈতিক লক্ষ্যে পরিণত করে।

ইংরেজদের গোলামীর যুগে ভারতের মুসলমানদের সামনে সবচাইতে বড় সমস্যা ছিল অখণ্ড জাতীয়তা। খেলাফত আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে পড়ার ফলে এ বিপদ অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দেয়। মুসলমানরা জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বারবার পরাজয় বরণ করায় তাদের মধ্যে নৈরাশ্যের অন্ধকার নেমে আসে। জাতীয় নেতৃবৃন্দ একে একে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন, নচেৎ পরপারের ডাকে চলে গিয়েছিলেন কিংবা জাতির আস্থা ও শ্রদ্ধা খুইয়ে বসেছিলেন। এ অবস্থায় কংগ্রেস মুসলমানদের নরম মোম ভেবে তাদের পদানত করে ফেলতে চাইছিলো। এ জন্যেই সে অখণ্ড জাতীয়তার আন্দোলনকে তীব্রতর করে তুলছিল। চিন্তা ও জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে পশ্চিমের সমগ্র রাজনৈতিক চিন্তার ভিত্তিতে অখণ্ড জাতীয়তার ধারণাকে পেশ করা হচ্ছিল। ঐ পরিস্থিতিতে কোরআন-সুন্নাহর আলোকে বলিষ্ঠ ও অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে কংগ্রেসী মত খণ্ডন করার মতো তেমন কেউ ছিল না বললেই চলে। গণ-সংযোগ (Mass Contact) অভিযানের নামে কংগ্রেস মুসলমানদেরকে তাদের নিজ দলে বিলীন করে নেয়ার চেষ্টা অত্যন্ত ব্যাপক ভিত্তিতে চালিয়েছিল। অপরদিকে, মুসলিম নামধারী একশ্রেনীর লেখক রুটি-রুজীর প্রশ্নকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়ে প্রকাশ্যভাবে কম্যুনিজমের প্রচারণা শুরু করেছিল। এমনকি জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের আলেমদের এক প্রভাবশালী শ্রেণী ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে বিরাট অবদান রাখলেও আজাদী লাভের আসল লগ্নে ভারসাম্য হারিয়ে বসেন। তারা শুধু কংগ্রেসের অখণ্ড জাতীয়তার সমর্থনেই লেগে পড়েননি, ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের লক্ষ্যে ভারত বিভক্তির বিরুদ্ধেও সক্রিয় ভাবে তারা কাজ করেন।

এই পটভূমিতেই মওলানা মওদূদী রাজনৈতিক ময়দানে এসে তাঁর খোদাদাদ জ্ঞান ও ধীশক্তির দ্বারা দ্বিজাতিতত্ত্বের বলিষ্ঠ প্রমাণ উপস্থাপিত করেন। তিনি কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণ করেন, এক দেশে সহাবস্থান করলেই সকলে এক জাতি হয়ে যায় না। ফলে, পাকিস্তান সৃষ্টির পথে এক বিরাট বাধা অপসারিত হয়। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ কুরআন সুন্নাহ্র প্রমাণ সমৃদ্ধ তাঁর এসব যুক্তি প্রমাণ দ্বারাই কংগ্রেস ও অখণ্ড ভারতের দাবিদারদের লা-জওয়াব করেছিলেন। মওলানা মওদূদীর তখনকার লিখিত প্রবন্ধাদি শুধু জ্ঞান-গবেষণা ও যুক্তিগত প্রমাণাদি, ঐতিহাসিক সাক্ষ্য, অনুপম বর্ণনা ও প্রভাব-শক্তির দিক থেকেই নতুন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয় বরং এগুলোর সর্বোত্তম কৃতিত্ব এই যে, এ সব লেখার ফলেই ইসলামী জাতীয়তার ধারণা একটি রাজনৈতিক লবেবপড়ে ফেলা যায়- এটা ছিল হিন্দু নেতাদের সব চাইতে মারাত্মক চক্রান্ত। খোদ্ মুসলিম লীগ এ বিষয়টির ধর্মীয় দিককে অধিকতর উজ্জ্বল করে তোলার প্রয়াস পায়, যাতে করে কংগ্রেসের চক্রান্তকে জনগণ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে এবং আপন দ্বীন ও ঈমানের দাবী পূর্ণ করার দিকে মনোযোগী হতে পারে। (পাকিস্তান আন্দোলন ও আলেম সমাজ ঃ চেরাগে রাহ, নযরিয়া -এ পাকিস্তান সংখ্যা।

ঐ সময় এবং বর্তমানে কংগ্রেস সমর্থক জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের ভক্ত আলেম ও তাদের শিষ্যরা কেন যে মওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে এত খাপ্পা এবং তাঁর বিরুদ্ধে সদা বিষোদগার করে থাকেন, এ আলোচনা থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেহেতু জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ নেতা দেওবন্দের মরহুম মওলানা হোসাইন আহ্মদ মাদানী যুক্ত জাতীয়তার সপক্ষে যুক্তি দিতেন এবং মওলানা মওদূদীর 'জাতীয়তাবাদ' গ্রন্থে এই মতের নীতিগত সমালোচনা করে যুক্ত জাতীয়তার অসারতা দেখানো হয়, তাই সে রাজনৈতিক বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসাই এখন নানা" শরঈ রূপ ধারণ করে কংগ্রেসী মতের আলেমদের পক্ষ থেকে মওদূদীর বিরুদ্ধে ফতওয়া আকারে আত্মপ্রকাশ করে। একশ্রেণীর আলেমের মওদূদী বিরোধিতার এই রাজনৈতিক পটভূমি না জেনে পাকিস্তান সমর্থক কিছু কিছু আলেমও তাঁর ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে থাকা ও 'মোৎমায়েন' হতে না পারার অন্যতম মূল কারণ এখানেই। এছাড়া, ধর্মনিরপেক্ষ শাসকদের মদদে আরও দু'একটি মহল মাঝে মধ্যে ফতওয়াবাজির দ্বারা মওলানা মওদূদী সম্পর্কে ধূম্রজাল সৃষ্টির যে অপচেষ্টা করেন, তারাও যেহেতু উক্ত শ্রেণীর আলেমদের নিকট থেকে এবং পরোক্ষভাবে হাদীস অস্বীকারকারী (মুন্কেরীনে হাদীস) ও কাদিয়ানীদের পরিবেশিত মাল-মশলার সাহায্যেই এসব করে থাকেন, এজন্যে বর্তমান যুগসমস্যা ও ইসলামী ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে এসব ব্যাপারে তারতম্যজ্ঞান কাজে লাগানো

প্রতিটি মুসলমান বিশেষ করে আলেম সমাজের একান্ত কর্তব্য।

আল্লামা ইকবালের সমর্থন ঃ পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল মওলানা মওদূদীর তখনকার রচনাবলী দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত ছিলেন। লাহোরের "ইকদাম" সম্পাদক প্রখ্যাত সাংবাদিক মিয়া মুহাম্মদ শফীর ভাষায়–মরহুম ইকবাল মওলানা মওদূদীর "তারজুমানুল কোরআনের" ঐ সকল রচনা নিয়মিত পড়িয়ে শুনতেন। এগুলোর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েই আল্লামা ইকবাল মওলানা মওদূদীকে হায়দারাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ছেড়ে পাঞ্জাব চলে আসার আহ্বান জানান। আর সেই আহবানেই মওলানা সাহেব ১৯৩৮ সালে পাঞ্জাব চলে আসেন। মিয়া মুহাম্মদ শফী তাঁর লাহোরের ডাইরিতে লিখেছেনঃ

"মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী (Nationalist) মুসলমানদের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন আর আমি এখানে পূর্ণ দায়িত্বের সাথে বলছি যে, আমি আল্লামা ইকবালের মুখে প্রায়ই এ ধরণের কথা শুনতাম যে, "মওদূদী এই কংগ্রেসী মুসলমানদের দেখে নেবেন।" মরহুম ইকবাল একদিকে (মওলানা) আযাদ ও মওলানা মাদানীর কঠোর সমালোচক ছিলেন; অপরদিকে তিনি মওলানা মওদূদীর তারজুমানুল কোরআন খুঁজে এনে পড়িয়ে শুনতেন। আর একথা শতকরা একশ ভাগ দায়িত্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, আল্লামা ইকবাল এক পত্র মারফত মওলানা মওদূদীকে হায়দারাবাদের (দাক্ষিণাত্য) পরিবর্তে পাঞ্জাবকে তাঁর কর্মস্থল রূপে গ্রহণ করার আহবান জানিয়ে ছিলেন' –(সাপ্তাহিক ইকদাম, ৯ই জুন, ১৯৬৩ খৃঃ)। সামরিক শাসনকালে রচিত শাসনতন্ত্র কমিশনের উপদেষ্টা ও কোম্পানী আইন কমিশনের সভাপতি এবং সাবেক আইয়ুব সরকারের পররাষ্ট্র উযীর সাইয়েদ শরীফুদ্দীন পীরযাদা তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ 'পাকিস্তানের ক্রমবিকাশ' (Evolution of Pakistan) গ্রন্থে মওলানা মওদূদীকেও পাকিস্তানের অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। উক্ত বইয়ের ২৫৮ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেনঃ

In a series of articles in the 'Tarjumanul Quran' in 1938 Moudodi unmasked the congress and warned the Muslims. He related the History of the Mislims of the sub-Continent debunded Congress Secularism and showed the unsuitability of (United) India for democratic rule as there would be only one Muslime vote as against three Hindu votes. "মওলানা মওদূদী তারজুমানুল কোরআনের এক ধারাবাহিক

প্রবন্ধের সাহায্যে (যা ১৯৩৮ থেকে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়) কংগ্রেস মতের মুখোশ সম্পূর্ণ উন্মোচিত করেন এবং মুসলমানদের ইতিহাস পর্যালোচনা করে কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ উদঘাটন করেন এবং এ সত্যকে প্রমাণ করে দেন যে, ভারতের বিশেষ পরিবেশে পশ্চিমা ধরনের গণতন্ত্র অনুপযোগী, কারণ এতে মুসলমানদের এক ভোট আর হিন্দুরা তিন ভোটের অধিকারী হবে।"

মওলানা মওদূদী কর্তৃক ভারত বিভাগের প্রস্তাব

"তিনি (মওলানা মওদূদী) হিন্দুদের জাতীয় সাম্রাজ্যবাদের কঠোর সমালোচনা করেন এবং এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, নিছক যুক্তনির্বাচন কিংবা আইন পরিষদের কিছু বেশী প্রতিনিধিত্ব (Weightage) এবং চাকরি-বাকরিতে একটি হার নির্ধারণের দ্বারা মুসলিম জাতির রাজনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসা হবে-না। এ ব্যাপারে তিনি যে প্রস্তাব পেশ করেন, তাতে তিনটি বিকল্প পন্থার নির্দেশ করেছিলেন।" (-Evolution of Pakistan.)

এই পন্থাগুলোর মধ্যে সর্বশেষ পন্থাটি ছিল দেশ বিভাগ। এ কারণেই সাইয়েদ শরীফুদ্দীন পীরযাদা পাকিস্তানের ক্রমবিকাশ ধারার পরিণতিতে পৌঁছে অকপটে প্রকাশ করেছেনঃ "স্যার আবদুল্লাহ্ হারুন, ডক্টর লতীফ, স্যার সেকান্দর হায়াত, জৈনিক পাঞ্জাবীনেতা, সাইয়েদ জাফরুল হাসান, ডক্টর কাদেরী, মওলানা মওদূদী, চৌধুরী খালেকুজ্জামান প্রমুখ যে প্রস্তাব ও পরামর্শ দেন, তাই এক অর্থে পাকিস্তান পর্যন্ত পৌঁছুবার পথে মাইল স্তম্ভস্বরূপ।" -(ঐ, পৃষ্ঠা ২৫৮)

বক্তব্য প্রমাণের জন্যে এসব উদ্ধৃতির প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু যারা তখনকার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত নয়, কেবল তাদেরই সুবিধার্থে এই সহায়ক উদ্ধৃতিগুলো এখানে পেশ করা হলো। এথেকে সহজেই অনুমান করা চলে যে, মুসলমানদের আজাদী সংগ্রামে মওলানা মওদূদীর কলম কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তবে তিনি মুসলিম লীগের সঙ্গে সক্রিয় হয়ে কাজ করলেন না কেন, সেটা দীর্ঘ আলোচনার ব্যাপার। সংক্ষেপ কথা হলো এই যে, তিনি পাকিস্তানের সমর্থক হলেও মুসলিম লীগের কর্মনীতির সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করতেন। মওলানা মওদূদী ভারতীয় মুসলমানদের যে খেদমত করে আসেন, তা ছিল মূলতঃ তত্ত্ব, তথ্য ও চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে। যখন আজাদী আন্দোলন শেষ পর্যায়ে আসে এবং

ভারত-বিভাগের সময় ঘনীভূত হয়, তখন তিনি এ দুই ভূখন্ডের মুসলমানদের পরবর্তী পর্যায়ে কর্মসূচী কি হবে, সে নিয়ে গভীরভাবে আত্মনিমগ্ন ছিলেন। কেননা, তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন যে, ভারত বিভক্তির পর ভারতের বৃহত্তর অংশে যে কোটি কোটি মুসলমান অবশিষ্ট থাকবে, তাদের মধ্যে দ্বীন ও ঈমানের সত্যিকার আলো জ্বালিয়ে রাখার কি ব্যবস্থা হবে? এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর একে যখন তুরস্কের ন্যায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করণের প্রচেষ্টা চলবে কিংবা এখানে নাস্তিক্যবাদের প্রচার চলবে, সে সময় এ জাতিকে উক্ত ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষাকল্পে প্রথম থেকেই জ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিকল্পনা তৈরী এবং পরিচালনার জন্যে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। বলা বাহুল্য, এ দায়িত্বই তিনি পালন করেন।

জামায়াতে ইসলামী গঠন ঃ এ পরিকল্পনার পরই তিনি ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হবার এক বছর পর (১৯৪১ সালে) "জামায়াতে ইসলামী" গঠন করে ইসলামী নেতৃত্ব দানের উপযোগী লোক তৈরীর কাজে মনোনিবেশ করেন এবং সম্ভাব্য বিভক্ত ভারতের অপর অংশের মুসলমানদের নেতৃত্বের জন্যেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কেননা, মওলানা মওদূদী তাঁর জ্ঞানদীপ্ত চোখে দেখতে পেয়েছিলেন যে, পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে মুসলিম লীগের সামনে কোনো পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ছিল না। [যার প্রমাণ হলো ৪৭-এর পর দীর্ঘ ২৪ বছর যাবত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে একাধারে মুসলিম লীগ ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও দেশটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত না হওয়া] মুসলিম লীগ যে কর্মসূচী নিয়েছে, তাতে দেশ স্বাধীন হলেও মুসলিম মিল্লাত জাতি হিসাবে যে শক্তি বলে তার স্বাধীনতা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে রক্ষা করবে, তা তাদের কর্মসূচীতে অনুপস্থিত। এ ছাড়া গুটিকয়েক নেতা ছাড়া অধিকাংশের চরিত্র, ধ্যান-ধারণা ও যোগ্যতাও তাকে আশ্বস্ত করতে পারেনি যে, এঁদের দ্বারা পাকিস্তান যথার্থ ইসলামী বলে প্রমাণিত হতে পারবে। আর বাস্তবেও তাঁর এই আগাম আশংকা যথার্থ বলে প্রমাণিত হয় এবং এর প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ২৩/২৪ বছরের ইতিহাসই এর জ্বলন্ত প্রমাণ. তাই মওলানা মওদূদী যে মহান কাজ সম্পাদনে ব্যাপৃত ছিলেন, সেটা তৎকালীন শাষকদল মুসলিম লীগের করণীয় কাজটিই তিনি সম্পাদন করেছেন। এদিক থেকে জামায়াত ভারত বিভক্তির মধ্য

দিয়ে মুসলমানদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের পরিপূরক সংস্থা হিসাবেই কাজ করেছে। এ জামায়াতের কোনো বিরোধিতা ছিল না, যা কোনো কোনো লোক উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচার করে বেড়ায়। মওলানা মওদূদীর খোদাপ্রদত্ত প্রজ্ঞা এবং জামায়াত গঠনের সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপের ফলে আজ উপমহাদেশে যুগ-সমস্যা, আধুনিক মানস ও চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় সঠিক পন্থায় ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দানের মতো লোকের ব্যবস্থা হয়। বিশাল ভারতের আনাচে-কানাচে বর্তমানে বিক্ষিপ্ত কোটি কোটি মুসলমানকে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে অটল রা[illegible], অমুসলমানদেরকে অতীত ও বর্তমান ভ্রান্ত ধারণার খপ্পর থেকে ইসলাম সম্পর্কে পরিচিত করানো, দাঙ্গা উপদ্রুত মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে আসা এবং মুসলানদেরকে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতিতে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করা এবং ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের বিরাট দায়িত্ব পালন করছেন ভারতে বসবাসকারী জামায়াতে ইসলামী কর্মীবৃন্দ। আর এদিকে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে ইসলামের স্বার্থে এ জামায়াত ইসলাম বিরোধীদের হাত থেকে একে রক্ষায় কিরূপ আপোষহীন সংগ্রামে নিয়োজিত, তাতো সকলের চোখের সামনেই বিদ্যমান। নিজেরা আত্মকলহে ব্রাশ ফায়ারে প্রতিপক্ষ গ্রুপের আটজন ছাত্রকে হত্যা করে জামায়াত ও তার সমর্থক ছাত্রদের উপর দোষ চাপানো সহ অসংখ্য মিথ্যাচারের মোকাবেলা করে তাকে কাজ করতে হয়।

গণভোটে পাকিস্তান সমর্থন

সাবেক সীমান্ত প্রদেশ ও সিলেটের গণভোট গ্রহণকালে মওলানা মওদূদী জনগণকে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির পক্ষে ভোট দেয়ার আহবান জানিয়ে বলেছিলেনঃ

"আমি যদি সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী হতাম, তাহলে গণভোট কালে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির পক্ষেই ভোট দিতাম। এ কারণে যে, ভারতের বিভক্তিটি হিন্দু- মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে সম্পাদিত হচ্ছে। কাজেই যে এলাকায়ই মুসলিম জাতি সংখ্যাগুরু, স্বভাবতঃ সে এলাকা মুসলিম জাতীয়তাভিত্তিক অঞ্চলের শামিল হওয়াই বাঞ্চনীয়। -(অর্ধ-সাপ্তাহিক 'কাউসার' ৫ই জুলাই, ১৯৪৭ খৃঃ)

ভারত বিভাগের প্রায় তিন মাস পূর্বে ১৯৪৭ সালের ৯ ও ১০ই মে তারিখে আয়োজিত জামায়াতের নিখিল ভারত সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার উপসংহারে মওলানা মওদূদী বলেন ঃ

"এখন এটা প্রায় স্থিরীকৃত যে, দেশ বিভক্ত হবে এবং এক অংশ অমুসলিম সংখ্যাগুরুর কর্তৃত্বাধীনে থাকবে। প্রথম অংশে আমরা জনমত সংগঠন করে খোদায়ী আইন-কানুনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বুনিয়াদ গড়ে তোলার চেষ্টা করবো। একটি ধর্মহীন জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তুলনায় এটি খোদায়ী খিলাফত যা মুহাম্মদ (সাঃ) এর আনীত শিক্ষার ভিত্তিতে কায়েম হবে– একদিকে খোদ পাকিস্তানবাসীর জন্যেও এবং মুসলিম বিশ্বের জন্যেও, অপরদিকে গোটা দুনিয়ার জন্যে রহমত ও আশীর্বাদ হতে পারে তা আপনারা দেখবেন।" –(তারজুমানুল কোরআন)

দেশ বিভাগের পূর্বে মওলানা মওদূদী এসব বলিষ্ঠ অভিমত প্রকাশ করেন। আর ঐভাবেই চিন্তা ও জ্ঞান-গবেষণার দিক দিয়ে সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্টকে তিনি জোরদার করে তোলেন। এর সঙ্গে সঙ্গে যেসব ক্ষেত্রে বাস্তব সহযোগিতা সম্ভবপর ছিল, সেখানেও তিনি অবদান রাখতে ইতস্ততঃ করেননি।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার খসড়া কমিটি ও মওলানা মওদূদী

ইসলামী জাতীয়তা সম্পর্কে মওলানা সাহেবের তৎকালীন রচনাবলী মুসলিম লীগ মহল অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচার করে।

সর্বোপরি যুক্ত প্রদেশ মুসলিম লীগ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার খসড়া তৈরীর জন্যে আলেমদের একটি কমিটি গঠন করলে মওলানা মওদূদী সানন্দে তার সদস্য পদও গ্রহণ করেন। সে কমিটির একজন গবেষণা সহকারী মওলানা মুহাম্মদ ইসহাক সানদিলভী যে প্রাথমিক খসড়া (Warking Paper) তৈরী করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা প্রকাশিত হয়েছে। তার ভূমিকায় মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেনঃ

"সম্ভবত ঃ ১৯৪০ কিংবা তার পূর্বের কথা, মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ মনে করলেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রের (পাকিস্তান) দাবি জোরে-শোরে তোলা হচ্ছে, তার শাসনতন্ত্র কিংবা আইনগত ভিত্তিকেও খাঁটি ইসলামী বানানো প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে যুক্তপ্রদেশ মুসলিম লীগ শরঈ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি ক্ষুদ্রায়তন কমিটি গঠন করেন। ইসলামী শাসনতন্ত্র কমিটির চারজন সদস্যের নাম আমার খুব ভাল করেই স্মরণ আছে। তারা হলেন ঃ

১। মওলানা সাইয়েদ সোলাইমান নদভী ২। মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ৩। মওলানা আযাদ সোবহানী ও ৪। মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী। (ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ঃ দারুল মুছান্নেফীন, আজমগড়)

মওলানা মওদূদী সম্পর্কে কায়েদে আযমের উক্তি

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ইসলামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের রীডার জনাব কমরুদ্দীন খানের একটি প্রবন্ধের উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখযোগ্য। জনাব কমরুদ্দীন লিখেছেন যে, তিনি মওলানা মওদূদীর অভিপ্রায়ে কায়েদে আযমের সাথে সাক্ষাত করেন এবং মাহ্‌মুদাবাদের রাজা সাহেবের সহায়তায় দিল্লীর "গোলে রা'নায়" আমাদের সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করা হয়। কায়েদ আযম পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে আমার কথা শুনতে থাকেন। এবং তারপর বলেন –"মওলানা মওদূদীর খেদমতকে তিনি অত্যন্ত পছন্দনীয় চোখে দেখছেন। কিন্তু উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্যে এই মুহূর্তে বেশী জরুরী একটি স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জন। তাদের চরিত্র সংশোধনের কাজের চাইতে এখন এই কাজটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।" তিনি বলেন, "জামায়াত এবং লীগের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই। জামায়াত একটি মহৎ উদ্দেশ্যে কাজ করছে আর লীগ একটি জরুরী সমস্যার প্রতি লক্ষ্য আরোপ করেছে– যার সমাধান না করা হলে জামায়াতের কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে না।" - (Weekly Thinker The Quidi-Azam by Reminon December-1963)

এ হচ্ছে মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান আন্দোলনে মওলানা মওদূদীর প্রকৃত ভূমিকা। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর যখন মওলানা মওদূদী ও মওলানা শাব্বীর আহ্‌মদ উসমানীর নেতৃত্বে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার জনদাবীওঠে, তখন কতিপয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজতন্ত্রী নেতা মওলানা মওদূদীর ন্যায় প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতার ইসলামী আন্দোলনের ক্রম-অগ্রগতি এবং মওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানীর অনুসারীদের ইসলামী তৎপরতা প্রত্যক্ষ করে ঘাবড়ে যায়। তারা ঐসব দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরামসহ মওলানা মওদূদীকে সমাজের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করে এখানে ইসলামী আন্দোনকে দুর্বল করার চেষ্টায় নিয়োজিত হয়। এই উদ্দেশ্যে বাতিল শক্তিগুলো এসব বুজর্গানে দ্বীন সম্পর্কে, যারা আজীবন ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে দেশ, ধর্ম ও সমাজের খেদমত

করে আসছেন–কাউকে 'আমেরিকার দালাল' কাউকে 'দেশবিরোধী' কাউকে প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাকার বলে তাদেরকে সমাজে হেয় করার চেষ্টা চালায়। অবশ্য এসব উক্তি তাদের নিজেদেরই পায়ের তলার মাটি সরিয়ে দেয়। বিশেষ করে যে মওলানা মওদূদী দ্বিজাতিতত্ত্বের বিশিষ্ট যুক্তি দিয়ে কংগ্রেস ও কংগ্রেস সমর্থক ওলামায়ে কেরামের একজাতিতত্ত্বের যুক্তিকে অন্তসারশূন্য বলে প্রমাণিত করলেন, তাঁকে ও তাঁর ইসলামী আন্দোলনকে বানচাল করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে তারা তাঁকে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস সমর্থক আলেমদের পর্যায়ে ফেলে অবিভক্ত পাকিস্তান বিরোধী রূপে চিত্রিত করার অপচেষ্টা চালায়। উপরোক্ত তথ্যাবলীর আলোকে আজাদী আন্দোলনে মওলানা মওদূদীর ভূমিকা সুস্পষ্ট। বলা বাহুল্য, বাতিলপনন্থীদের সেই একই ভূমিকা এখনকার ইসলামী আন্দোলন কারীদের বিরুদ্ধেও নানান চরিত্রে অব্যাহত।

উপসংহার

এ পর্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে উপমহাদেশের আজাদী আন্দোলনে সামগ্রিকভাবে আলেম সমাজের কি অবদান ছিল, তার মোটামুটি ধারণা পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এবার আমরা আজাদী-উত্তরকালে দেশ সেবা, সমাজ সেবা ও জাতীয় আদর্শ রক্ষায়, রাজনীতি, অর্থনীতিতে এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তথা এদেশকে একটি শোষণহীন জনকল্যাণমূলক ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে "ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের ইতিহাস" নামে অপর একটি গ্রন্থে তাঁদের সংগ্রামী ভূমিকাকে তুলে ধরার প্রয়াস পাবো। আল্লাহ্ যেন এই মহান প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়িত করার তওফীক দেন,সে জন্য সকলের কাছে দোয়াপ্রার্থী। –আমীন॥